তৃতীয় অধ্যায়

বাদল সরকারের নাট্যভাবনা : তৃতীয় ধারার থিয়েটার

বাদল সরকার তাঁর নাট্য জীবনের প্রথম দিকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই মেনে নিয়েছিলেন। শহরের লোক বলে সে সময় প্রসেনিয়াম ছাড়া বাদল সরকারের সামনে অন্যকোন পথ ছিল না। ১৯৬৭ সালে যখন বাদল সরকার 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠী পত্তন করেন তখন নিজের মতো করে নিজের নাটকগুলি প্রযোজনা করার তাগিদই তাঁর মুখ্য দায় ছিল। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ''থিয়েটার সম্পর্কে আমার ধারাণায় আমি কোনো ভাবেই ভিন্নধর্মী ছিলাম না, থিয়েটারে সেট ও আলোকসম্পাতসহ প্রোসেনিয়ম মঞ্চ তখন আমি অনিবার্য বলেই মেনে নিয়েছি। শতাব্দী তখন কোনোভাবেই কলকাতার অন্য যেকোনো 'গ্রুপ থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠী থেকে পৃথক ছিল না।''[১]

প্রথম দিকে প্রসেনিয়ামে সেই অর্থে সাফল্যের মুখ না দেখতে পেলেও একটা সময় তাঁর নাট্যদল 'শতাব্দী' গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তাঁর নিজস্ব স্থান তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তিনি যখন সাফল্যের শিখরে ঠিক তখনই প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। প্রথমে অঙ্গনমঞ্চে ও পরে মুক্তমঞ্চে নেমে এলেন যার পোশাকি নাম থার্ড থিয়েটার। এইখানেই প্রশ্ন উঠে ঠিক কী কী কারণে, বা কী পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে বাদল সরকার এতদিনের প্রচলিত মঞ্চ থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন, এর মূলে কোন্ কোন্ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল ছিল? থার্ড থিয়েটার বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? কীভাবে থার্ড থিয়েটারকে একটি নাট্যআন্দোলনে পরিণত করেছেন?

১

বাদল সরকার খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন— ''অঙ্গনমঞ্চে বিশ্বাস আমার রাতারাতি আসেনি। ১৯৫৮ সালে যখন প্রথম Theatre in the round- দেখি বিদেশে তখন থেকেই চিন্তার সূত্রপাত।''[২] ১৯৫৭-৫৯ সাল, এই দু'বছর বাদল সরকার কর্মসূত্রে লণ্ডনে কাটিয়েছেন। সেই সময় তিনি এরিনা মঞ্চে Theatre in the round -দেখেন। এর কয়েক বছর পর প্যারিসে থাকার সময়ও তাঁর theatre in the round-এ থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ১৬.১২.১৯৬৪-তে মনু-কে লেখা একটি চিঠিতে বাদল লিখেছেন:

> ''...গত রবিবার থিয়েটারে গেলাম। Theatre in the round-এ প্যারিসে একটা এরকম থিয়েটার নিয়মিত চলে। ... লণ্ডনে একটা দেখেছি, আর বইয়ে পড়ছি। মাঝখানে গোল জায়গায় অভিনয় হয়, চারিদিক ঘিরে সার্কাসের মতো দর্শকদের আসন...।''[৩]

লণ্ডনে একবার দেখে এবং Theatre in the round সম্পর্কে পড়ে থিয়োরিটিক্যালি যে-কটা পয়েন্ট বুঝেছিলেন, প্যারিসে দেখে তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয় তাঁর। থিয়েটার যে ঠিক প্রসেনিয়াম মঞ্চে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি এই প্রথম বুঝতে পারেন। তিনি অনুভব করলেন প্রচলিত স্টেজের থেকে এই মাধ্যমে দর্শককে অনেক বেশি নাড়া দেওয়া সম্ভব। সেট, সাজসজ্জাহীন অনাড়ম্বরভাবে এমন জীবন্ত নাটক দেখার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তাঁর থিয়েটার ভাবনাকে পুষ্ট করেছিল। তবে তখনও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চেই নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তখনও তিনি প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করেননি। প্রসেনিয়ামে থাকাকালীন এই থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন উঠলেও এর থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প কিছু করার চিন্তাভাবনা তখনও তাঁর মনে দানা বাঁধেনি। এরই মধ্যে ১৯৬৯সালে দু'মাসের জন্য বাদল সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের অঙ্গরূপে পূর্ব ইউরোপের তিনটি দেশ রাশিয়া, পোলাণ্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করে আসেন।

১৯৬৯ সালে পোলাণ্ডে গিয়ে বাদল সরকার জর্জ গ্রোটোস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর নাটক 'Apocalypsis cum Figuris'-এর অভিনয় দেখেন। গ্রোটোস্কি দেখিয়েছেন, মানুষ তার শরীর দিয়ে কী করতে পারে তার সর্বোচ্চ নিদর্শন। এতোদিন ধরে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মঞ্চসজ্জা, আলো, রূপসজ্জা, দৃশ্য বিন্যাস-এগুলির চাইতে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর এবং তাদের শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি তাঁর নাট্যবস্তুকে দর্শকের কাছে হাজির করতে চেয়েছেন। গ্রোটোস্কি মনে করতেন, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, এমন কী একটি মঞ্চ ছাড়াই থিয়েটার করা যেতে পারে। তাঁর থিয়েটার কর্ম দেখে, তাঁর 'টুওয়ার্ডস-এ পুওর থিয়েটার'-পড়ে এবং গ্রোটোস্কির সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় বাদল খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গ্রোটোস্কির সঙ্গে কথা বলে তিনি যে উপকৃত হন সেকথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার লিখেছেন—

> ''There are certain things he had said which I liked very much and I think I can understand it and some ways have used them.''[৪]

প্রায় একই রকমভাবে সেই ভালো লাগার কথা বলেছেন তাঁর লেখা 'The third Theatre' গ্রন্থে।

তিনি বলেছেন—

> "... Grotowski's work and his comments on theatre ware fresh in my mind."[৫]

প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন মনে তৈরি হলেও এতদিন সেখান থেকে বের হওয়ার পথ তাঁর জানা ছিল না। এবার সেই পথ যেন খুঁজে পেলেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে যেমন একমাত্র পথ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি সেই সঙ্গে এটাও মেনে নিয়েছিলেন এই থিয়েটার করার জন্য পয়সা কড়ির দরকার হয়। থিয়েটার হল ভাড়া থেকে শুরু করে সেট, লাইট-সব কিছুর জন্য প্রচুর খরচ। একটা সময় শতাব্দী প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। গ্রোটোস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তাঁর থিয়েটার কর্ম দ্বারা বাদল নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। ১৯৬৯ সালে ক্যালচারাল এক্সসেশন প্রোগ্রাম থেকে ফিরে এসে বাদল সরকার গ্রোটোস্কির পুওর থিয়েটারের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে জোর দিলেন খরচ কমানোর দিকে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> ''আমরা ক্রমেই মঞ্চসজ্জা, আলো, সাজপোশাক ও আবহ সংগীত কমাতে লাগলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, আমরা টেপ রেকর্ডার বা প্রোজেক্টর-এর মতো কোনো যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করব না। সঙ্গে সঙ্গেই আক্ষরিক অর্থে আমরা পুওর থিয়েটার তথা গরিব নাট্যের ধারণাটা গ্রহণ করলাম। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী গরিব, আমাদের দেশবাসী গরিব, আমরা চাইছিলাম আমাদের সেই দারিদ্র্যকেই আমরা এমনভাবে কাজে লাগাব যাতে প্রতিবন্ধ না হয়ে সেই দারিদ্র্যই আমাদের সম্পদ হয়ে ওঠে।''[৬]

১৯৬৯ সালের প্রথম প্রযোজনা 'প্রলাপ' তারপর 'সারারাত্তির', 'শেষ নেই', 'বল্লভপুরের রূপকথা' সবই পুওর থিয়েটারের ধারণা নিয়ে তৈরি। বাদল সরকার সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> ''বল্লভপুরের রূপকথা'র টোটাল সেট খরচ পড়েছিল ৬৫ টাকা। বলতে পারেন পুওর থিয়েটারের দিকে একটা স্বভাবিক প্রবণতা তখনই দেখা দেয়।''[৭]

এই যে থিয়েটারের খরচ কমানোর ভাবনা এটাই প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রথম পদক্ষেপ। থিয়েটার যে সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা ছাড়াও সম্ভব এটা এবার বাদল সরকার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারলেন। এইভাবে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিপুল খরচের হাত থেকে রক্ষা করে শতাব্দীকে গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন। কিন্তু পাশাপাশি বাদল সরকার উপলব্ধি করলেন এভাবে কতদিন? থিয়েটারকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়? তিনি

দেখলেন যে থিয়েটারের দর্শক কমছে। কলকাতার অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারের মতো শতাব্দীরও একই অবস্থা। দর্শকের অভাবে অনেক সময় হল ভাড়া পর্যন্ত পকেট থেকে বের করতে হয়। সকলেই সিনেমায় যাচ্ছে। তাহলে কি থিয়েটার খুব একটা দুর্বল মাধ্যম? এই প্রশ্ন বাদল সরকারকে আলোড়িত করেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন খামতিটা কোথায়। সিনেমার প্রতি তুলনায় তিনি দেখলেন যে সিনেমার মতো সমস্ত কিছু যথাযথ বাস্তবিক দৃশ্য দেখানো থিয়েটারে সম্ভব নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> ''থিয়েটার কী পারে? সিনেমায় অনেক কিছু দেখাতে পারে, সমুদ্রে ঝড়, পাহাড়, অভিনেতার ক্লোজ-আপ...। আমাদের চিৎকার করতে হয় লাস্ট রো-কে শোনানোর জন্য, সামনের লোক বিরক্ত হয়। সিনেমায় মৃদুস্বরে কথা বললেও সকলে শুনতে পায়।''[৮]

কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও তাঁকে আলোড়িত করেছিল কী জোর আছে থিয়েটারে যে, এত বছর পরেও তা টিকে আছে? তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার জীবন্ত, বাস্তব। অর্থাৎ থিয়েটার হচ্ছে এখন, এখানে; সিনেমা কিন্তু তা নয় সেখানেই থিয়েটারের আসল শক্তি। তিনি বলেছেন—

> ''সিনেমাতে একটা প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে বলুন দেখি— এটা পুকুরঘাটের সিঁড়ি? পারবেন না। থিয়েটারে কোনও অসুবিধে নেই। একজন অভিনেতা ইচ্ছে করলেই অভিনীত চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকদের সরাসরি দুটো কথা বলে গেলেন, বলে আবার চরিত্রে ঢুকলেন-এ থিয়েটারেই গ্রহণযোগ্য, সিনেমা নয়।''[৯]

তিনি উপলব্ধি করলেন থিয়েটার হল জীবন্ত কলা মাধ্যম বা লাইফ শো। যেখানে দর্শক এবং অভিনেতা একই দিনে একই সময়ে, একই স্থানে উপস্থিত হচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ এক সঙ্গে থাকছেন। অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের এই যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এটা একমাত্র থিয়েটারেই সম্ভব সিনেমায় নয়। তিনি বলেছেন—

> ''থিয়েটার অন্যান্য জায়গায় হয়তো সিনেমার চেয়ে অনেক দুর্বল কিন্তু এখানে সে শক্তিশালী। মনে হয়েছে, এখানেই জোর দেওয়া উচিত।''[১০]

বাদল সরকার অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কমিউনিকেশন বা সংযোগের উপরেই এবার গুরুত্ব দিলেন। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সংযোগের উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন উভয়ের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান। সেক্ষেত্রে দু'দিকের ব্যবধান যতটা সম্ভব ঘোচানো উচিত। তখন তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দিকে তাঁকিয়ে দেখলেন তাতে বাধায় ভরা—

এক. স্তরের বাধা: অভিনেতা অভিনেত্রীরা থাকে উঁচুতে একটা স্তরে, দর্শকাসনে দর্শক থাকে নীচে, আবার ব্যালকনি থাকলে আরো এক স্তর তৈরি হয়।

দুই. দূরত্বের বাধা: সবাই একদিকে বসে বলে শেষ সারিটা অনেক পেছনে। যাদের বেশি দামের টিকিট তারা থাকে সামনে। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের এই কারণে একটা অসমদূরত্ব তৈরি হয়।

তিন. আলো আর অন্ধকারের বাধা: এটা সবচেয়ে বড় বাধা বলে বাদল সরকার মনে করেছেন। দর্শক নাটক দেখতে এসে তারা থাকে অন্ধকারে আর অভিনেতা থাকে আলোয়। সব কিছু করা হয় দর্শকদের জন্য, কিন্তু অভিনেতাদের ভান করতে হয় যেন তারা নেই। তাদের হাঁচি-কাশি বন্ধ, চুপ করে বসে একদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

এই বাধাগুলো কীভাবে দূর করে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান কমানো যায় সেই বিষয়টি বাদল সরকারকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন এইসব প্রশ্ন মাথায় ঘুরলেও প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন পুরো ছয়ের দশক। এবার যেন একটাপ পথ খুঁজে পেলেন। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তিনি বহুদিন আগে দেখা সেই 'থিয়েটার ইন দ্য রাউণ্ড' পদ্ধতিকেই বেছে নিলেন। দর্শকের সমস্তরে নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে অভিনয় ক্ষেত্রটা ভাগ করে নিলেন। এখানে প্রচলিত মঞ্চ আর থাকল না, মঞ্চ ব্যবস্থারও কোনো আয়োজন থাকল না। তাদেরই একটি অংশে মেঝের ফাঁকা জায়গাটাকেই মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হল। দর্শক ও অভিনেতা উভয়ই আলোতে একই ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। একই সমতলে দাঁড়িয়ে বা বসে দর্শক অভিনয় দেখতে পারে। তৈরি হয়ে গেল অঙ্গনমঞ্চ। থিয়েটার ইন্ দ্য রাউণ্ডকেই এক-রকম ভাবে অঙ্গনমঞ্চ বলেন বাদল সরকার। প্রাথমিক ভাবে এরকম একটা চেষ্টা, তাঁর কথায় এক্সপেরিমেন্টাল শো করেন ১৯৭১ সালের ২৪ শে অক্টোবর কলকাতার অলবেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ.বি.টি.এ.)-এর হল ঘরে। প্রযোজনা করলেন গৌরকিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে লেখা নাটক 'সাগিনা মাহাতো'। 'সাগিনা মাহাতো' করার পর বাদল সরকারের মনে হল— 'এইটাই— করতে চাই।'[১১] অনেকদিন থেকেই এই রকম একটা মঞ্চকে গ্রহণ করার ইচ্ছে জেগে উঠেছিল বাদল সরকারের মনে। কিন্তু তবুও তিনি প্রসেনিয়ামেই নাটক করে গেছেন পুরো ছয়ের দশক। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা মাথায় ছিল, কিন্তু প্রয়োগের পথ পাচ্ছিলেন না। খরচ কমানোর প্রয়োজন এবং সংযোগ বাড়ানোর তাগিদ থেকেই তিনি প্রসেনিয়ামের চিরপ্রচলিত মঞ্চ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবলেন। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেন—

''১৯৭১ সালে যখন আমি 'সাগিনা মাহাতো' লিখলাম তখনই উপলব্ধি করলাম

আমার প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় উপস্থিত। ২৪শে অক্টোবর— সাগিনা মাহাতো প্রথম মঞ্চের বাইরে অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন হলে দেখানো হল। নাটক চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই চলল নাটক। পরে আলো ঠিক করা গেলেও— মঞ্চসজ্জায় লাইট ব্যবহার করা যায়নি। এই অবস্থায় অগণিত দর্শক উপভোগ করলেন নাটক। নবজাগরণের একটা ঢেউ উঠল, বুঝলাম মঞ্চসজ্জা ছাড়া নাটক চলতে পারে।"[১২]

প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় হয়েছে বললেও তখনও কিন্তু বাদল সরকার পুরোপুরি প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। প্রসেনিয়ামেও কাজ করছেন এবং সাথে সাথে অঙ্গন মঞ্চেও কাজ করছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা নাটকই সামান্য অদলবদল করে অঙ্গন মঞ্চে করেছেন। অর্থাৎ প্রথম প্রথম শতাব্দী একই সঙ্গে দু'ধরনের থিয়েটার দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। 'সাগিনা মাহাতো', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'আবু হোসেন' যখন প্রসেনিয়াম মঞ্চে চলছিল কল-শোও আসছিল বিভিন্ন দিক থেকে তখনি 'সাগিনা মাহাতো' নিয়ে আসেন অঙ্গন মঞ্চে। 'সাগিনা মাহাতো'-কে নিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে অঙ্গন মঞ্চের উপযোগী করে অভিনয় শুরুর পরেও, পরের বছরই ১৯৭২-এ শতাব্দী প্রসেনিয়ামে মঞ্চস্থ করলেন গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন'। এমনকি ১৯৭২-এর ৩০ অক্টোবর ইম্ফলে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি প্রসেনিয়ামেই মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি লেখাও হয়েছিল সেইভাবে। অর্থাৎ অঙ্গন মঞ্চ তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই ছিল।

অঙ্গনমঞ্চে এইসব পরীক্ষামূলক অভিনয়ের সময়ই ভারত সরকারের জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ (জুন ১৯৭১-মে ১৯৭৩) পেলেন বাদল সরকার। 'তখন মাথায় চিন্তাগুলো খুব ধোঁয়াটে। প্রসেনিয়ম থিয়েটারের দোষ খুঁজে বার'[১৩] করছেন। 'গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র রূপে সমন্বয়ের থিয়েটারের লক্ষ্যে কর্মপরীক্ষা তথা ওয়ার্কশপ' নামে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দায়িত্ব পেয়ে তখন তিনি নানাভাবে থিয়েটার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা করছেন। থিয়েটার কর্মের সূত্রেই এই সময় আলাপ হয় আমেরিকার 'Environmental Space theatre' অন্যতম প্রবক্তা রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে। ১৯৭১ সালে শেখনায়ের সঙ্গে বাদল সরকারের প্রথম আলাপ কলকাতায়। ঐ সময়ে শেখনার ও তাঁর স্ত্রী জোয়েন শেখনার ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় বাদল সরকারের পিয়ারি রোডের বাড়িতে বসে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হয়। এমনকি 'সাগিনা মাহাতো' অঙ্গনমঞ্চে সফল অভিনয়ের পর মঞ্চে দেখা করতে আসেন রিচার্ড এবং তার স্ত্রী জোয়েন শেখনার। উভয়ের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। কলকাতায় নানান আলোচনা সভায় এমনকি মাদ্রাজেও চলে গিয়েছিলেন বাদল সরকার শেখনার-এর সব আলোচনার মধ্যে থাকা এবং তাঁর নানান প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশায়। শেখনার ছিলেন

প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী। যেহেতু বাদল সরকার প্রসেনিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা ভাবছেন পুরোপুরি সেই কারণে প্রসেনিয়ামের ঘোর বিরোধী শেখনারকে তাঁর ভালো লাগে।

> ''সালটা ১৯৭১। বাদল সরকারের অঙ্গনমঞ্চের পরীক্ষার সময়। বাদল সরকার নিজেই বলেছেন রিচার্ড শেখনারের 'Environmental Space theatre' তাকে মুগ্ধ করেছে। কারণ রিচার্ড শেখনার 'Conventional proscenium stage' ব্যবহার করেননি। আর ঐ সময় বাদল সরকারও ঐ জাতীয় কিছু করার পরিকল্পনা করেছেন।''[১৪]

১৯৭২-এর জুলাই মাসে জওহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ-এর দাক্ষিণ্যেই শেখনারের আমন্ত্রণে বাদল সরকার আমেরিকায় যান। সেখানে রিচার্ড শেখনার ও তাঁর পরিচালিত 'দ্য পারফরম্যান্স গ্রুপ'-এর নাট্যকর্ম দেখেন। সেখানে তিনি দেখলেন স্টেজ ব্যবহার না করেও কীভাবে থিয়েটার করা সম্ভব। এটি আয়ত্ত করতে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Performance Group-এ যোগ দেন। ওয়ার্কশপ করেন, রিহার্সাল দেখেন। দেখে তিনি অভিভূত হন। কীভাবে স্পেসকে ব্যবহার করা হচ্ছে, দর্শকদের কীভাবে রাখা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ ঘটছে এ সমস্তই বাদল সরকারের দেখার বিষয় ছিল। কীভাবে দর্শক নাটকীয় আবহের অংশ হচ্ছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল বাদল সরকারের কাছে। সংযোগের এক নতুন ভাষা যেন তিনি খুঁজে পেলেন শেখনারের নাট্যকর্মে। যে মানুষ এক সময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনেই বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি দেখলেন কিছুটা হলেও শেখনারের দল তা করতে পারে। তিনি দেখলেন থিয়েটার ও মানুষের সংযুক্তির একটা প্ল্যাটফর্ম; বাদল সরকার এটাই চান।

এর পাশাপাশি আমেরিকার জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনার 'লিভিং থিয়েটার' ও বাদল সরকারকে সমৃদ্ধ করেছে। আমেরিকাতে থাকাকালীন মূলত শেখনারের সূত্র ধরেই 'লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের পরিচয়। তিনি এখানে দেখলেন রাজনৈতিক দর্শনকে কীভাবে থিয়েটার শিল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যে কাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে করা যায়— সে কাজ যে থিয়েটারের মধ্যেও করা যায় শিল্পিতভাবে তার উপলব্ধি ঘটল লিভিং থিয়েটার দেখে। লিভিং থিয়েটারে মতাদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই মূল কথা। জনসংযোগ তৈরি করা, মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব দর্শনকে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা লিভিং থিয়েটারে করা হয়। নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রচার না করেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শনটি থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরার পাঠ পেলেন লিভিং থিয়েটারে।

নেহেরু ফিলোশিপ শেষে যখন ফিরে এলেন কলকাতায়, বাদল সরকারের মাথায় তখন আর প্রসেনিয়াম থিয়েটার নেই এমনকি তাঁর সেই ক্লাসিক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' ও তিনি পেরিয়ে এসেছেন— তার অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা প্রসেনিয়ামে বাঁধা ছিল। এতদিনের সব প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন; যে চিন্তা এতদিন অগছালো ভাবে ছিল, 'ধোঁয়াটে' ছিল, দ্বন্দ্ব-সংশয় ছিল এবার তার নিরসন হলো। এবার তিনি প্রসেনিয়াম ছেড়ে পুরোপুরি চলে এলেন অঙ্গনমঞ্চে। আগস্টের শেষে কলকাতায় ফিরে এসে লিখে ফেললেন হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকুস' উপন্যাস অবলম্বনে অঙ্গনমঞ্চের জন্য প্রথম নাটক 'স্পার্টাকুস'। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> ''... এ উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ কয়েকবার করেছি, সাহসে কুলোয়নি। সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত 'প্রসেনিয়ম' মঞ্চ ছেড়ে এসে 'অঙ্গন মঞ্চ' ধরলাম।''[১৫]

এর আগেই অঙ্গন মঞ্চের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করেছেন এ.বি.টি.এ-এর হল ঘরে। এবার পাকাপাকি ভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চের পরিবর্তে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় শুরু করলেন। ১২-ই নভেম্বর, ১৯৭২ অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিনতলার হল ঘরে 'স্পার্টাকুস'-এর অভিনয় দিয়ে শুরু হল অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়। তিনি জানিয়েছেন—

> ''... 'অঙ্গনমঞ্চ'-এর ভাবনাকে আমরা রূপ দিলাম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ৩০x২৮ ফুট এর ঘরে। ... আমরা ঘরের সাধারণ আলোয়, কোনো সাজসজ্জা ও সামগ্রী ছারাই নাটক করলাম। দর্শকদের সামনে রেখে নয়, বরং তাদের চারিদিকে তাদের সঙ্গে জায়গা ভাগ করে নাট্যপ্রযোজনা করলাম।''[১৬]

নির্মিত হলো নাট্যের এক অন্যভাষা, পাওয়া গেল অন্য পথের সন্ধান। প্রসেনিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে এই ফর্মেই বাদল সরকার প্রায় একলাফে দর্শকের অনেক কাছে চলে গেলেন। দর্শক-অভিনেতার যে ব্যবধান ছিল সেই ব্যবধানটা আর থাকল না। 'স্পার্টাকুস'-এর হাত ধরে বাংলা থিয়েটার একটি পৃথক ধারার সন্ধান পেল। থিয়েটার মানেই তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা আলোকিত আয়তক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকের অন্ধকারে সন্নিবেশ-এই যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চিন্তার আধিপত্য বা hegemony অঙ্গনমঞ্চ দারুণ প্রতিস্পর্ধায় তাকে প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকারের স্বীকারোক্তি—

> ''আমি বুঝতে পারলাম, নাট্যসংস্কৃতির অনুশীলন করা সিনেমার সঙ্গে এক অযৌক্তিক দৌড় প্রতিযোগিতায় বন্দী করে রেখেছে নিজেদের। সিনেমা অনেক বেশি নির্মাণধর্মী। এ ছাড়া আমি নিজেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কে বীতস্পৃহ

হয়ে উঠেছিলাম। কারণ প্রতিপদে অজস্র প্রতিবন্ধকতার এর। বিশেষ করে ওই আলো-আঁধারির ব্যাপারটা। এর উপস্থাপন রীতিটাও অবাস্তব। যদিও নাট্য পরিচালক ও অভিনেতারা তাদের সাজসজ্জা, নাট্য-সরঞ্জামের ভিতরে বসে এক নিরাপদ ঘেরাটোপে অধিষ্ঠিত। আঁধারে বসে থাকা দর্শকদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনেক। কিন্তু-নাট্যকলার মতো এক সজীব শিল্পমাধ্যম আমাকে বাধ্য করল স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে প্রয়াসী হতে।"[১৭]

প্রসেনিয়ামের বিকল্প একটি থিয়েটারের সন্ধান করেছেন বাদল সরকার। সেই বিকল্প পথের সন্ধান এবার তিনি পেয়ে গেলেন। যার প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র ওই অঙ্গন মঞ্চ। 'স্পার্টাকুস'-এর সাফল্যের পর পুরোনো 'শতাব্দী' ভেঙে একেবারে নতুন ভাবে শুরু হল শতাব্দীর পথ চলা। একেবারে নতুন একটা পর্বে পদার্পণ ঘটল বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দীর। অ্যাকাডেমি-তে দু'বছরের একটা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করে প্রত্যেক রবিবার অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যান তিনি। স্পর্টাকুস'-এর পর 'প্রস্তাব', 'মুক্তমেলা', 'মিছিল' এই নাটকগুলি ছাড়া প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে অ্যাকাডেমির অঙ্গনমঞ্চে। যেমন— 'সাগিনা মাহাতো', 'আবু হোসেন', 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'ত্রিংশ শতাব্দী'। অঙ্গনমঞ্চ কিন্তু একেবারেই নিরাভরণ ছিল না। 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল'-এর মতো কিছু নাটকে টুল, ছোট বেঞ্চ, সঙ্গে হাতের নাগালে থাকা আলোর সাহায্যে প্রত্যেক প্রযোজনায় নতুন ভাবে থিয়েটারের এই স্পেসকে ব্যবহার করা শুরু করেন বাদল সরকার। পরে 'প্রস্তাব', 'মুক্তমেলা' ইত্যাদি করে অঙ্গমঞ্চের থিয়েটার কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জোরালো হতে পারে তা প্রমাণ করেছেন। অঙ্গনমঞ্চ প্রসেনিয়াম না হলেও তার নির্দিষ্ট ঘর ছিল, অর্থাৎ নাটক দেখতে হলে ঢুকতে হবে এবং তা টিকিটবিহীনও নয় তখন। তবে প্রোডাকশন খরচ কমে যাওয়ায় টিকিটের মূল্য কমানো হয়েছে অনেক। আবার দর্শক সংখ্যার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। থিয়েটার প্রেমীদের জন্য মেম্বারশিপের ব্যবস্থা করা ছিল। মেম্বারশিপের জন্য চার টাকা এবং বছরে ছয় টাকা চাঁদার ব্যবস্থা ছিল। তবে প্রথম তিনশ জনের পরে মেম্বারশিপের জন্যও ছয় টাকা ধার্য ছিল। আবার লাইফ মেম্বারদের জন্য ছিল ২০০ টাকা। তবে নন-মেম্বারদের জন্য প্রথমে পাঁচ টাকা টিকিট থাকলেও পরে তা নেমে দু'টাকা হয়েছিল। প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গনমঞ্চে বাদল সরকারের উত্তরণ ঘটলেও এইসব সীমাবদ্ধতা থেকেও তিনি বেরুতে চেয়েচিলেন। অঙ্গনমঞ্চ প্রসেনিয়াম না হলেও প্রসেনিয়ামের মতোই তখনও চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী। দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্যেই অঙ্গনমঞ্চে নেমে এসেছেন, অথচ গুটিকয়েক দর্শকের মধ্যে তখনও আটকে আছেন। অর্থ থেকেও পুরোপুরি মুক্ত নয়। এই সময় হলের মালিক পক্ষ অস্বাভাবিক রকম হলভাড়া বাড়িয়ে

দেয়। দু'বছরের চুক্তি শেষে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ হল ঘরের ভাড়া দ্বিগুণ করে দেওয়ায় বন্ধ হয় এখানকার নিয়মিত নাট্যাভিনয়। বাদল সরকার তখন বিকল্প কিছু ভাবতে বাধ্য হন।

বাদল সরকারের অঙ্গন মঞ্চ নিয়ে নাট্যচর্চা শুরুর প্রায় এক বছর আগে নাট্যকার পরিচালক বীরসেনের 'সিল্যুয়েট' নাট্যাগোষ্ঠী 'ওপেন এপিক থিয়েটার' নামে দিনের আলোয়, তিন পাশে বা শুধু সামনে বসিয়ে মাঠ মঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু করে। ১৯৭১-এর ১১ ডিসেম্বর 'মুক্তি আশ্রম' নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই ধরনের নাট্যাভিনয় শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কার্জন পার্কের এই মুক্ত নাট্য। খবরটা ছড়িয়ে পড়ামাত্র, শহর এবং শহরতলির বহুনাট্যদল এগিয়ে এল এখানে। অভিনীত হল নানান ধরনের নাটক। যেভাবে প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় হয় ঠিক সেইভাবেই একপাশে অথবা তিনপাশে দর্শক বসিয়ে নাট্য প্রযোজিত হল। কেউ কেউ 'সেট', 'প্রপস' ব্যবহার করে নাট্যাভিনয় করেছে এই মাঠ মঞ্চে। কেন এই মাঠ মঞ্চে অবতরণ? এ প্রসঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস চক্রবর্তী বলেছেন—

> ''আসলে সিল্যুয়েট সহ অধিকাংশ নাট্যদলই কলকাতার প্রসেনিয়াম মঞ্চ ভাড়া নিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয় করবার চেষ্টায় অসমর্থ হয়ে ধারে দেনায় পর্যুদস্ত হয়ে এই মাঠ-মঞ্চে নাট্যাভিনয় শুরু করে। এখানে টাকা পয়সার তেমন প্রয়োজন হয় না। প্রচার হয় খুব ভালো। অভিনয় শেষে দর্শকের স্বেচ্ছাদানে সব খরচ উঠে যেত।''[১৮]

বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের সীমিত দর্শককে ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দিতে এই মাঠমঞ্চের পদ্ধতিকেই এবার গ্রহণ করলেন। ১৯৭৩-এর মার্চ শনিবার বিকেলে কার্জন পার্ক (সুরেন্দ্রনাথ পার্কে) বাদল সরকার ও তাঁর 'শতাব্দী' নাট্যদল অঙ্গনমঞ্চের নাটক 'স্পার্টাকুস' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নেমে পড়লেন এই মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে। এইভাবে বাদল সরকারের প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্গন এবং অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে উত্তরণ ঘটল। চার দেওয়ালের বাইরে, মুক্ত আকাশতলে অবারিত প্রাঙ্গনে যত খুশি দর্শকের সামনে গিয়ে হাজির হলেন বাদল সরকার নিজের নাটক নিয়ে। এতোদিন দর্শক আসত অভিনয় দেখতে, এবার বাদল সরকার তাঁর দল নিয়ে চলে গেলেন দর্শকের কাছে। খোলা জায়গার এই মাঠ মঞ্চে—এখানে সব খোলা-সব উন্মুক্ত-দর্শক-অভিনেতা একাকার। এখানে মঞ্চ নেই, মঞ্চ ব্যবস্থা নেই। আলাদা আলোর ব্যবস্থা নেই। দৃশ্যসজ্জা নেই, সাজসজ্জা নেই, মেকআপ নেই। সর্বোপরি অঙ্গনমঞ্চে যে টাকাপয়সার বিষয়টি ছিল, মুক্তমঞ্চে এসে সেই ভাবনা থেকেও মুক্ত হলেন। এবারে সব দ্বিধা কেটে গেল। বাদল সরকার পেয়ে গেলেন আর এক নতুন

নাট্যপথের সন্ধান। তবে অঙ্গনমঞ্চ ত্যাগ করেননি। এই সময় বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই একটার পর একটা নাট্যাভিনয় করে গেছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা বহু নাটক সামান্য সম্পাদনা করে অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় যেমন করেছেন, তেমনি আবার অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা বেশ কিছু নাটক মুক্তমঞ্চে অভিনয়ের উপযুক্ত করে অভিনীত হয়েছে তাঁর নির্দেশনায়। এ প্রসঙ্গে দেবাশিস চক্রবর্তী বলেছেন—

> "... মাঠ মঞ্চ এবং অঙ্গন মঞ্চে নাট্যচর্চার মধ্যে নাট্য নির্মাণ এবং নাট্য উপস্থাপনায় কিছুটা ফারাক থাকলেও দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। ফলে অঙ্গন-মঞ্চে এবং মাঠ-মঞ্চে নাট্যচর্চা একই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন তিনি।"[১৯]

তবে তিনি ধীরে ধীরে অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হন বাদল সরকার। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তিন তলার অঙ্গনমঞ্চে অভিনয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল, সিন্ধি অ্যাসোসিয়েশন হল, প্রজ্ঞানানন্দ ভবন, লোরেটো ডে স্কুল-এ অঙ্গনমঞ্চে নাট্যাভিনয় হলেও নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে ইচ্ছে মতো কাজ করবার সুযোগ ছিল না। নানা কারণে প্রায় প্রত্যেক হল কর্তৃপক্ষের থেকেই বাদল সরকার একটা সময় প্রত্যাখ্যাত হন। এমন একটা স্থায়ী অঙ্গনমঞ্চ পেলেন না যেখানে অঙ্গন মঞ্চের নাট্যরীতি নিয়ে, নাট্য প্রয়োগ নিয়ে, নাট্যে আলোর প্রয়োগ, দর্শকের বসার আসনের আয়োজন সব কিছু নিয়ে নানাভাবে কাজ করা যায়। বাদল সরকার তাই ক্রমাগত খোলা মাঠের মুক্তমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ওপর আরও বেশি জোর দিতে লাগলেন। একটি সুস্পষ্ট অনুভব তাঁকে এ পথে সামিল করেছিল। সে অনুভব থিয়েটার নিয়ে, যে অনুভব সমাজব্যবস্থা নিয়ে, যে অনুভব আক্রান্ত সাধারণ মানুষদের নিয়ে। এই অনুভবের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বাদল সরকার—

> "... থিয়েটার কার? থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের। সর্বসাধারণের। ...থিয়েটার কোথায়? থিয়েটার পাড়ায়, হাটে ,রাস্তায়। যেখানে মানুষ। সব মানুষ। ... থিয়েটার মানুষের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষে মানুষে বন্ধন।...থিয়েটার দেওয়াল- ছাদ নয়। থিয়েটার খোলামাঠ আর আকাশ। ... থিয়েটার সজীব প্রাণ। ... থিয়েটার জীবনের নগ্ন কঠিন চেতনা।"[২০]

বাদল সরকার সব বাধা ভেঙে মানুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়েই অঙ্গনমঞ্চ থেকে নাটককে জনতার মুক্তমঞ্চে হাজির করতে চেয়েছেন।

২

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে বাদল সরকারের নাট্যভাবনা নিয়ে দশটি প্রবন্ধ সম্বলিত 'দি থার্ড থিয়েটার' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই বাদল সরকারের নাট্যরীতি 'থার্ড থিয়েটার' নামে অভিহিত বা কথিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

> ''আমি প্রথমে আমার বইটার নাম দিই 'থার্ড থিয়েটার'। তারপর আমাদের থিয়েটারকে 'থার্ড থিয়েটার' বলতে আরম্ভ করে আমাদের কর্মীরা। এখন আমিও মেনে নিয়েছি।''[২১]

নিজের নাট্যরীতিকে সরাসরি 'থার্ড থিয়েটার' নামে চিহ্নিত না করলেও 'থার্ড থিয়েটার' নামটি যে তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত এবং তিনি তাঁর থিয়েটার রীতি সম্পর্কে এই নামটি মেনে নিয়েছিলেন, তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাদল সরকার প্রবর্তিত অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ রীতির নাট্য থার্ড থিয়েটার নামেই পরিচিতি লাভ করেছে।

'থার্ড থিয়েটার' কথাটি এই দেশে বাদল সরকার প্রথম ব্যবহার করলেও বহু আগে থেকেই ইউরোপ-আমেরিকায় এটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি ১৯০৫ সালে আয়ারল্যাণ্ডের নাট্যব্যক্তিত্ব সিনজ্ থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। তিনি সিরিয়াস নাটককে ফাস্ট থিয়েটার এবং বাণিজ্যিক উপকরণ সম্বলিত নাটককে সেকেণ্ড এবং যেখানে সিরিয়াস নাটককে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা হয় তাকে বলেছেন থার্ড থিয়েটার।

'থার্ড থিয়েটার' সম্পর্কে প্রায় একই রকম কথা বলেছেন মার্কিন নাট্যসমালোচক রবার্ট ব্রুস্টাইন। তাঁর 'The Thired Theatre' (১৯৭০) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখানে তিনি থার্ড থিয়েটারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে বাস্তববাদী থিয়েটার ক্রমশ আনন্দহীন হয়ে পড়েছে। অথচ সস্তা বাণিজ্যিক সংগীত মুখর নাটকে এত আনন্দ, এত হাসি থাকে যে মানুষকে সে তাৎক্ষণিক বিহ্বলতা দিতে সক্ষম। এই দুই থিয়েটারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে তৃতীয় ধারার থিয়েটার।

'থার্ড থিয়েটার' সংক্রান্ত আলোচনায় যার কথা না বললেই নয় তিনি হলেন ডেনমার্কের নাট্য পরিচালক গ্রোটোস্কির শিষ্য ইউজিনো বারবা (Eugenio Barba)। ১৯৭৬ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত থিয়েটার কনভেনশনে ইউজিনো বারবা 'এনকাউন্টার অন থার্ড থিয়েটার' নামক প্রবন্ধে থার্ড থিয়েটার সংক্রান্ত একটি তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। যা পরবর্তীকালে থার্ড থিয়েটারের ম্যানিফেস্টো হিসাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'ইন্টার ন্যাশনাল থিয়েটার

ইনফরমেসনস' (ITI) পত্রিকায় ১৯৭৭-এর শীত সংখ্যায় 'থার্ড থিয়েটার' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে প্রথম থিয়েটার বলতে তিনি বাণিজ্যিক তথা অনুদান প্রাপ্ত থিয়েটারগুলিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে দ্বিতীয় থিয়েটার হল 'আঁভা গার্দ' থিয়েটার, যেগুলি মূলত পরীক্ষামূলক এবং পরিচালকেরই প্রাধান্য। এই শ্রেণির থিয়েটারে অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকের হাতের পুতুল মাত্র। পরিচালকেরা অভিনেতাদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেন নিজেদের পরিচালনা শৈলী দেখাবার জন্য। আর তৃতীয় থিয়েটারে দর্শকের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের সময়ে নাটকের মুখোমুখি সংঘাতে দর্শককে তার অন্তর্জীবনের গভীর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। বারবা-এর মতে জর্জ গ্রোটোস্কির কাজেই এই থিয়েটার পূর্ণতা লাভ করেছে।

বাদল সরকার এইসব থিয়েটার সম্পর্কে যে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে বুঝা যায়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন:

> ''আমি জানি অন্তত দু-জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ দুটি আলাদা আলাদা অর্থ ও ইঙ্গিতে এই থার্ড থিয়েটার পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছেন। সে দুটি আবার আমাদের ধরনের থার্ড থিয়েটার থেকে আলাদা। আমি এই পরিভাষাটির ব্যবহার করেছি আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে—।''[২২]

জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপের (জুন ১৯৭১-মে ১৯৭৩) 'Project workshop for a theatre of synthesis as Rural-Urban Link' নামে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েই বাদল সরকার প্রথম-দ্বিতীয় এবং তৃতীয় থিয়েটারের প্রথম তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়ন করেন। তাঁর 'The Third Theatre' গ্রন্থটিও ঐ প্রকল্প থেকেই রচিত। তিনি বলেছেন প্রথম থিয়েটার-লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। যেটা ফোক বা ট্রাডিশনাল থিয়েটার। এই প্রথম থিয়েটার সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''আশ্চর্য এর আকর্ষণী ক্ষমতা গ্রামবাসীর কাছে। অথচ দু-একটি তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনও যোগাযোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেই সব দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি মানুষকে বলে— যা হয় তাই হয়, যা হয় তাই হবে। অর্থাৎ পরিবর্তন সম্ভব নয়, যা আছে যা হচ্ছে তা দেবতার বিধান, মেনে নাও।''[২৩]

অর্থাৎ প্রথম থিয়েটারের শক্তিশালী সংযোগ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা জীবনের প্রতি কোন ইতিবাচক বা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে না। অন্যদিকে প্রসেনিয়াম তথা নগরনাট্যকে তিনি বলেছেন দ্বিতীয় বা সেকেণ্ড থিয়েটার। এই থিয়েটারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও দেশের বৃহত্তর জনগণের কাছে না পৌঁছানোর জন্য তা সীমাবদ্ধ। এই থিয়েটারকে তিনি বলেছেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের

কর্মক্ষেত্র বা বিচরণ ক্ষেত্র। এই থিয়েটার বিলেত থেকে আমদানিকৃত। দু'শো বছর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল না এবং আমাদের দেশেও অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় লোকনাট্য-এ প্রসেনিয়ামের কোন স্থান নেই। এই থিয়েটার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> ''সেই থিয়েটারে সমাজ-পরিবর্তনের কথা, প্রগতির কথা বলা সম্ভব, বলা হচ্ছেও। কিন্তু যারা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সেই শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষ এ থিয়েটারে আসে না, এবং তাদের কাছে এই থিয়েটার নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, অসুবিধাজনক, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।''[২৪]

তাঁর মতে ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য বহন করে আজও ভারতে দুটি সমান্তরাল সংস্কৃতি একটি গ্রামে, একটি শহরে, কাব্য, চিত্রকলা, সংগীত সবকিছুর মতো থিয়েটারও সমান্তরাল ধারায় চলছে, মেলেনি, মিলবে না, যতদিন দেশের ঔপনিবেশিক চরিত্র ঘুচবে। প্রাথমিক ভাবে বাদল সরকার প্রথম থিয়েটার লোকনাট্য ও দ্বিতীয় থিয়েটার প্রসেনিয়াম থিয়েটার-এই দুইয়ের সিনথেসিস-এর উপর জোর দিয়েছেন— চেষ্টা করেছেন এই দুই থিয়েটারের একটা সমন্বয় করার। এক্ষেত্রে তিনি এই দুই থিয়েটারের রীতিকে বর্জন না করে দু'টি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে দুইয়ের সমন্বয় কথা বলেছেন তাঁর 'দি থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থে। 'The Third Theatre' গ্রন্থের ভূমিকায় বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "In such a situation, whether we want to revitalise the city theatre or the village theatre, we have to attack the root of this dichotomy, and attempt to create a link between two through a Third Theatre- a theatre of synthesis."[২৫]

এখানে 'তৃতীয় থিয়েটার' তাঁর মতে 'থিয়েটার অফ সিনথেসিস্'। বাদল সরকার তাঁর 'দি থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থে থিয়েটার অফ সিনথেসিসের কথা বলেছেন বলে অনেক 'তৃতীয় থিয়েটার' বলতে এই গ্রাম ও নগর নাট্যের থিয়েটার সিনথেসিস-এর কথাই বলে থাকেন। যেমন— নাট্য ব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন:

> ''... ফাস্ট থিয়েটার বলে তিনি লোকনাটকের যে-কথাটা বলেছেন এবং সেটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নাটককে ছেড়ে তিনি যে 'Theatre of Synthesis'-এর কথা বলছেন— মানে ঠিক ছেড়ে তো আর সিনথেসিস হয় না। এক অর্থে এইটা নয়, ওনা নয়, আমি একটা নাটক করছি, এর মধ্যে দুয়ের কিছু কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তার একটা Synthesis....''[২৬]

নাট্য সমালোচক দর্শন চৌধুরীও প্রায় একইভাবে বলেছেন—

> ''লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম— এই দুই থিয়েটারের রীতিকে স্পষ্টত বর্জন করে নয়, অভিনব ও অভাবিত কোনো কিছু সৃষ্টি না করে, পূর্বের দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে এবং দুইয়ের মিলন ঘটিয়ে তৈরি করা হল 'থার্ড থিয়েটার'।[২৭]

কিন্তু 'দি থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থ প্রকাশের সময় (১৯৭৮) 'গ্রাম ও শহরের যোগসূত্র স্বরূপ সমন্বয়ের থিয়েটার'কে থার্ড থিয়েটার বললেও পরবর্তীসময় তার কিছুটা বদল ঘটেছে। তখন বলেছিলেন লোকনাটক আর নগরনাট্য এই দুয়ে সিনথেসিস করে থার্ড থিয়েটার হবে। কিন্তু এই সিনথেসিস থেকে সরে আসেন। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকারের নিজের বক্তব্য এই রকম—

> ''যখন 'থার্ড থিয়েটার' বইটা লিখেছিলাম বা ঐ কাজগুলো আরম্ভ করেছিলাম তখন আমাদের এই দুটো কালচার অর্থাৎ দুটো থিয়েটার, গ্রামের থিয়েটার আর শহরের থিয়েটার, দেশজ থিয়েটার আর বিদেশ থেকে আমদানি করা দেশীয়করণ করে নেওয়া থিয়েটারের মধ্যে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পরে এই সমন্বয়ের চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেড়ে দিয়েছিলাম এই জন্য যে আমার মনে হয়েছিল ঐটা হবে না। একটা বিকল্প থিয়েটার তৈরি করার ব্যাপার আছে। তাই সমন্বয়ের প্রশ্নটা আর আসে না।''[২৮]

থার্ড থিয়েটার বলতে তিনি সেই নাট্যকে বলেছেন, যেটা লোকনাট্য পুরো নয়, আবার নগরনাট্য পুরো নয়। ''তখন বলেছিলাম যে আমাদের লোকনাটক আর নগরনাট্য এই দুয়ে সিনথেসিস করে থার্ড থিয়েটার হবে। সেটা থাকেনি। এখন থার্ড থিয়েটার হয়েছে লোকনাটক, নগরনাট্য তারপর একটা বিকল্প থিয়েটার। সেটাই এখন থার্ড থিয়েটার।''[২৯] অর্থাৎ এখন বাংলা থার্ড থিয়েটার বলতে, যা দাঁড়িয়েছে তা হল, সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত একটি বিকল্প থিয়েটার যা লোকনাট্যও নয় আবার নগরনাট্যও নয়।

কেন এই বিকল্প নাট্যের প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাট্যব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন:

> ''বাদলদা, সমাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে যে ভাবে কথা বলেন, যে পদ্ধতিতে গিয়ে তিনি সেটা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করছেন, সেটা প্রোসেনিয়ম থিয়েটার কি পারত না! এখানে এইটুকু আমার মনে হয়,

বাদলদা যে-পথটা নিয়েছেন, সে-পথটা আরও বেশি বৈজ্ঞানিক, এবং মানুষের আরও কাছাকাছি যাবার পক্ষে বেশি অনুকূল।"[৩০]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় থিয়েটারকেই যোগাযোগের সঠিক মাধ্যম বলে মনে হয়েছে বাদল সরকারের। এ যোগাযোগ নাট্যিক নয় সামাজিক সচেতনতার সঞ্চালনও। তাই তিনি আরও গভীরভাবে মন্তব্য করেছেন—

"... তৃতীয় থিয়েটার কোনও নতুন নাট্যশৈলীর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নয়; এ থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন।"[৩১]

'থিয়েটারের ভাষা' গ্রন্থে বাদল সরকার জানিয়েছেন:

"কি বলতে চাইছি, কেন বলতে চাইছি, কাকে বলতে চাইছি— এইসব প্রশ্নের সঙ্গে এই থিয়েটারের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। এই সব প্রশ্নই এই বিকল্প থিয়েটারের উৎস এবং ভিত্তি। থিয়েটারের শৈলীর, থিয়েটারের ভাষার রূপান্তর অবশ্যই ঘটবে, তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্যেই নতুন শৈলী, নতুন ভাষা দাবী করবে; কিন্তু এমন আদৌ নয় যে থিয়েটারের শৈলী ও ভাষার রূপান্তর ঘটানোই উদ্দেশ্য; এবং সেই অনুসারে যা হয় কিছু বক্তব্য গ্রহণ করা চলে। তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা এবং সেই কারণেই স্বভাবতই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন। গবেষণাগারে প্রসূত একটা অভিনব নাট্যশৈলী নয়, মাঠে-ঘাটে পরীক্ষিত যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের ভিত্তি।"[৩২]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার বা বিকল্প থিয়েটারের মূল কথা হল দর্শকের সঙ্গে সংযোগ। আর এখানেই এই থিয়েটার হয়ে উঠেছে বিকল্প থিয়েটার। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে এই থিয়েটার মুক্ত। প্রসেনিয়ামে দর্শক মূলত শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত; দর্শক অর্থের বিনিময়ে নাটক দেখে, উপভোগ করে অর্থাৎ একটি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক থেকে যায়। প্রসেনিয়ামের মঞ্চসজ্জা , মেক-আপ, লাইট, সাউন্ড সবই ব্যয়বহুল যার ফলে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে তা দেশের বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টি লক্ষ্য করেই মন্তব্য করেছেন—

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য;"[৩৩]

বাদল সরকার এই দুঃসাধ্যকে সাধ্য করেছেন প্রসেনিয়ামের বাহুল্যতা বর্জন করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''থিয়েটারকে অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ ও শক্তিশালী করবার জন্য নেমে এসেছিলাম। নেমে এসেই উপলব্ধি করলাম যে থিয়েটারে দামি এবং ভারি জিনিসগুলো আর দরকার হচ্ছে না।''[৩৪]

আর এই কারণে থিয়েটারকে নিরাভরণ করে বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারকে করে তুললেন— 'পোর্টেবল, ফ্লেক্সেবল এবং ইনএক্সপেনসেবল'[৩৫]

১. **'পোর্টেবল' বা বহনীয়:** যেহেতু স্পট লাইট এসবের কোনও ব্যাপার নেই, তাই থিয়েটারের সামান্য যেসব সাজসরঞ্জাম লাগে তা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়।

২. **ফ্লেক্সিবল বা নমনীয়:** মানে যে কোন জায়গায় করা যায়, স্টেজ দরকার হয় না, দিনের আলোয় মাঠে করা যায়।

৩. **ইনএক্সপেনসেবল বা সুলভ:** থিয়েটারের দামি ও ভারি জিনিসগুলির প্রয়োজন না থাকায় গোটা ব্যাপারটাই হয়ে উঠে সুলভ। অর্থাৎ অর্থের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল নয়।

বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

''এক বিরাট মুক্তি যেন। অ্যাদ্দিন গ্রামে যেতে পারতাম না, কারণ সেখানে আগে জানতে হত ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা, পাকা রাস্তা আছে কিনা। এখন আর কোনও অসুবিধে রইল না, আমরা দিনের আলোয় করতে পারি, মাঠে করতে পারি, মঞ্চের প্রয়োজন নেই...।''[৩৬] এভাবেই 'ফ্রী থিয়েটারের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল।''[৩৭]

বাদল সরকার দু'টো অর্থে এই 'ফ্রি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। একটি হল 'মাগনা'। মানে দেখতে গেলে পয়সা লাগে না। সবচেয়ে গরীব লোকও থিয়েটার দেখতে আসতে পারে। আর একটা মানে আছে যাতে অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। 'ফ্রি' মানে সেখানে বাঁধন নেই, মুক্ত। টাকার ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত, মঞ্চের প্রচলিত ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত, মঞ্চমায়ার আবিলতা থেকে মুক্ত, স্থানের বন্ধন থেকে মুক্ত, আড়ম্বর থেকে মুক্ত, বেশভূষা-সাজসজ্জার ভার থেকে মুক্ত। অর্থাৎ তৃতীয় ধারার থিয়েটার সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাই মুখ্য। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন— ''থিয়েটার 'মানুষের ক্রিয়া', human action, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের ঘাড়ে ক্রেতার ভূমিকা, বিক্রেতার ভূমিকা চেপে গেলে সত্যিকারের থিয়েটার ব্যাহত হয়।''[৩৮] তৃতীয় থিয়েটারে তাই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক নেই। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা ব্যবহারিক হতে পারে, কিন্তু মানবিক সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু

থিয়েটারের ক্ষমতা আছে মানবিক ক্রিয়া হয়ে ওঠার। বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটার এই মানবিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। সেখানে দর্শক আসছে ফ্রি, তারা দর্শকদের ডাকছেন ফ্রি, তাতে কোন বন্ধন নেই। এখানেই বাদল সরকার কথিত তৃতীয় ধারার থিয়েটারের একটা দর্শন তৈরি হয়ে যায়। যখন ফ্রি হয়ে গেল তখন দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> ''সেই জন্য খুব গরীব জায়গাতে শো করলেও আমরা কিন্তু পয়সা তোলার চাদরটা ঘোরাই। তাদের কেন বঞ্চিত করব অংশগ্রহণ থেকে? তারা দশ পয়সা দিক, পাঁচ পয়সা দিক, দেওয়ার সুযোগটা পাক। এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই তাই পয়সা নেব না— তাহলেই কিন্তু ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর, আমরা উচস্তর। আমরা সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখি, দেখতে চাই, যেহেতু তা ফ্রি। এটাই মানবিক ক্রিয়া। এর সঙ্গেই দর্শনটা এসেছে।''[৩৯]

বাদল সরকার বিশ্বাস করেন, থিয়েটার সর্বসাধারণের। আর এটা বাস্তবায়িত করেছেন থিয়েটারকে একেবারে দেশের দরিদ্রতম মানুষটির কাছে হাজির করে। এর আগে থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, শহরের গ্রুপ থিয়েটারে অনেক বিপ্লবী থিয়েটার হয়েছে, তারা সমাজ পরিবর্তনের কথা বর্ললেও তা একটি নির্দষ্ট সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা আমাদেরই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ। তারা কখনই সামাজিক পরিবর্তনের শক্তি হতে পারে না। যারা শ্রমজীবী জনসাধারণ, যারা শ্রমিক মজুর তারা সেই প্রসেনিয়ামে পৌঁছচ্ছে না। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারের মাধ্যমে সেই সব মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে গেলেন। ফলে তাঁর তৃতীয় থিয়েটার হয়ে গেল বিষয়প্রধান। এখানে নাট্যশৈলীর খাতিরে বিষয়বস্তু নির্বাচন নয়, বিষয়বস্তুর জন্যে উপযুক্ত নাট্যশৈলীর অন্বেষণ করা হয়। এই কারণে এক একটা নাটকে এক এক রকম ফর্ম ব্যবহার করা হয়। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''... third theatre আমার কাছে কোন form-এর ব্যাপার নয়, আমার গোষ্ঠী 'শতাব্দী'র কাছেও নয়। আমার কাছে third theatre একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি। যে কথাগুলো আমরা বলতে চাইছি সেটাই আমাদের প্রাথমিক, সেখান থেকেই সব কিছুই শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ Content থেকেই সবকিছু শুরু হচ্ছে। আমরা কোন form-এর কাছে কমিটেড নই। কোন form কে Point- 'A' থেকে Point 'B'-তে নিয়ে যাবার কোন দায় আমাদের নেই।''[৪০]

অনেকে বাদল সরকারের থিয়েটারকে এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার বলেছেন। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটার সম্পর্কে এরকম ধারণা ঠিক নয়। বাদল সরকার নিজে এ বিষয়ে বলেছেন—

> ''... না এক্সপেরিমেন্ট জীবনে করিনি। এক্সপ্লোর করেছি, খুঁজেছি, অনুসন্ধান করেছি, তাই প্রত্যেকটা নাটক আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ... আমাদের পথ ওটা নয়। একটা নতুন ফর্ম বা নাট্যশৈলী সৃষ্টি করব, এটা আমাদের একটুও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ওই কথাটাকে সবচেয়ে তীব্রভাবে বলা, তার জন্যে এক্সপ্লোরেশন শব্দটাই যথেষ্ট।''[৪১]

তৃতীয় থিয়েটারের কনটেন্টটা কী? এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''... আমাদের থিয়েটারটা 'গিয়ার্ড টু সোশ্যাল চেঞ্জ' (geared to social change)। 'ইট ডাস নট মীন মাচ' (It does not mean much) — মানে ওটা খুব এক্সপ্লেন করে না তো। আমি সেখানে যখনই বলছি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রত্যেক নাটকে— এই সমাজটা খারাপ, এটা বদলাও, সেটা বলি না। কারণ সেটা অ্যাবসার্ড তো। ... সেখানে আমরা দুটো জিনিস চেষ্টা করি-হয়ে যায় চেষ্টাটা-একটা হচ্ছে এই সমাজটা বলবৎ রাখার জন্য প্রথম কথা কতগুলো সত্য গোপন করা হয়। যাদের স্বার্থে এই সমাজটা চলে, রাখা, কতগুলো সত্য তারা গোপন করে অথবা বিকৃত করে। এক নম্বর, আর জেনে শুনে কতগুলো মিথ্যা মিথ্‌স্ চালু করে, সেই মিথ-এ আস্তে আস্তে লোককে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে ওগুলো সত্য। আমাদের থিয়েটারের একটা কাজ হচ্ছে এই যে— সত্যগুলো চাপা দেওয়া হচ্ছে বা বিকৃত করা হচ্ছে বা যেখানে অর্ধ সত্য বলা হচ্ছে সেগুলোকে উদ্ধার করে প্রচার করা।''[৪২]

আর এই সূত্রেই থার্ড থিয়েটারের অভিনয়রীতি হয়ে যায় স্বতন্ত্র। সত্য জানাতে গেলে মুখোশ খুলতে হয়। আপনাকে দিয়ে রচনা করা আপনার আবরণ খুলতে হয়। আবরণ আর আভরণ সত্যকে বিকৃত করে সে জন্য অভিনয়ও যথাসম্ভব আভরণহীন হওয়া উচিত। জীবনের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে নাটকের তাহলে জীবন দিয়েই তা প্রকাশ করা উচিত। সেখানে চাতুরীর স্থান না থাকাই উচিত। অভিনয় যেমন মুখোশহীন হবে তেমনি হবে সহজাত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''অভিনয় কথাটার একটাই মানে— মানুষের ভিতরের কথা প্রকাশ করা। যে নাটক করছি, তার কথা যদি আমার নিজের কথা হয়ে না ওঠে, তবে থিয়েটার করা হয় না, নাটকটাকে কাঁধে বহন করে শবযাত্রা করা হয়।''[৪৩]

তৃতীয় থিয়েটার যেহেতু উপাদানের বাহুল্য থেকে মুক্ত স্বভাবতই থিয়েটারের সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়ে মানব দেহের উপর। প্রসেনিয়ামের নাটকের চোদ্দ আনা জুড়ে থাকে সংলাপ। সেখানে অভিনেতারা শুধু মঞ্চে হাজির হন; এছাড়া তাঁদের শরীরের বাড়তি কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু তৃতীয় থিয়েটারে অভিনেতার শরীর নাটকের মূল উপকরণ। অভিনয়ের সময় অভিনেতার শরীর ছাড়া আর বাকি সব কিছুই গৌণ। তাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সবকটি বাহ্যিক উপকরণ-পোষাক, আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি একেবারেই বাতিল হয়ে যায় এখানে। নাটকের বক্তব্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে কাজে লাগানো হয় শরীরকে। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''যেহেতু তৃতীয় থিয়েটারকে টাকার উপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না, সেইহেতু নমনীয় বহনীয় ও সুলভ তাকে হতে হবে এবং সেইহেতু দারিদ্র্যও তাকে স্বীকার করে নিতে হবে—...। কিন্তু থিয়েটারকে ব্যবহার করবো অস্ত্র হিসাবে, অথচ সে থিয়েটার শিল্পগতভাবে দরিদ্র হবে, অর্থাৎ অস্ত্রটা হবে ভোঁতা— তা তো মেনে নেওয়া যায় না। যদি না মানি, তবে সমস্ত জোরটা গিয়ে পড়বে ঐ মানবদেহের উপর, থিয়েটারের ঐ অপরিহার্য উপকরণের উপর। ঐ উপকরণটিকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য হয়ে উঠবে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে সে ব্যবহার বাধাই সৃষ্টি করবে নাট্যক্রিয়ায়। সে ক্ষেত্রে ঐসব উপকরণ ত্যাগ করে থিয়েটার দরিদ্র হবে না, দুর্বল হবে না, বরং আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।''[৪৪]

বাদল সরকারের নাট্যদর্শনের অন্যতম মূল কথাই হল শরীরের ওপর অনুশীলন। শরীরের ভাষাকে বাচিক ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত করা। শরীরী অভিনয়ের সুর, তাল, ছন্দকে সর্বাধিক অর্থবহ করে দর্শকের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা এর মূল লক্ষ্য। তবে বাদল সরকারের কাছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং মানে কোনো ফর্ম নিয়ে কসরৎ নয়, থিয়েটারের সম্ভাবনাকে বাড়ানোর চেষ্টামাত্র। তিনি জানিয়েছেন—

> ''শরীরী ভাষাকে অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করার খাতিরেই ব্যবহার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যেখানে আমরা দেখি, শরীর নাটকের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে পারছে, কেবলমাত্র সেখানেই আমরা একটা ব্যবহার করি। শরীরকে শুধু ব্যবহার করার জন্য কখনই ব্যবহার করি না। ... নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ীই আমরা শরীরী ভাষা ও শারীরিক অভিনয় ব্যবহার করি।''[৪৫]

অভিনয়ের ইতিহাসে বাস্তবোচিত অভিনয়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। যাকে আমরা ন্যাচারালিজম বলি। এই অভিনয়ে মানবদেহ বাস্তব আচরণকে নকল করে। তার ফলে দর্শক মনে এক ইলিউশনের সৃষ্টি করে যা নাট্যভাবনা প্রোথিত করতে যুক্তিহীন ভাবে সাহায্য করে। দর্শককে ভাবতে দেয় না এই নাটক ও নাট্যকর্ম সম্পর্কে কোন বিরোধী বিচার। এখানে ন্যাচারালিস্ট অভিনয়ের বিষ লুকিয়ে থাকে। এই বিষ বাদ দিয়ে দর্শকের বিচার-বুদ্ধিকে মুক্ত রাখতে গেলে ন্যাচারালিস্ট অভিনয়কেই বাদ দিতে হবে। অভিনয়ের শর্ত কোনো বাস্তবের নকল করা নয়। অভিনয়ের শর্ত হবে কোন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটানো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের কল্পনা শক্তিরও বিস্তার করা। এর ফলেই চলে আসে শরীরী অভিনয়। বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের রূপ নির্মাণে এই শরীরী অভিনয়কে ব্যবহার করেন, অবশ্যই তা তৃতীয় থিয়েটারের গড়ে ওঠা এবং দর্শন অনুসারে সৃষ্টি। কখনই তা নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিফলন নয়। এখানেই বাদল সরকার নিজস্বতায় সমৃদ্ধ।

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মূল ভিত লুকিয়ে আছে তাঁর সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর। ছাত্রাবস্থায় বাদল সরকার বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সে সময় তিনি পার্টির নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্তও ছিলেন। বাদল সরকার রাজনীতি করার সময় একটা সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে সবাই বেঁচে থাকবে, টিকে থাকা নয়। তখন তাঁর ভাবনা ছিল মানুষের জন্য কাজ করবেন, সাম্যের জন্য লড়াই করবেন, ''যদি মরেই যাই রাস্তার উপর মরবো, খানায় নয়, গর্তে নয়।''[৪৬] এমনই তখন তাঁর ভাবনা। সংগঠন করেছেন, বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর তিনি। তারপর এক সময় মোহভঙ্গ। এইসব সাধারণ মানুষের সংগ্রাম নিয়ে বাঁচার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন— হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। কিন্তু এই বাঁচা এবং বাঁচানোর চেতনা যায়নি ভেতর থেকে। তৃতীয় ধারার থিয়েটারের মধ্য দিয়ে সেই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাই প্রকাশ পেল। যে রাজনৈতিক বোধ বাদল সরকারের ছিল রাজনীতি করার ফলে সেটাই এবার সম্ভব হল থিয়েটারের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> ''... গোড়ায় যে রাজনীতির ব্যাপারটা ছিল, ... কখনো বিশ্বাসটা আসেনি যে থিয়েটারকে সেই ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়। এই এখন আবার বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। দেখলাম যে, দুটোর একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি কথা বলতে চাইছি, সমাজ সংক্রান্ত কথা, সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত কথা, যেটা রাজনীতির ক্ষেত্রে করতে চেয়েছিলাম সেটা এখন থিয়েটারের ক্ষেত্রে করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেল।''[৪৭]

থিয়েটারের মধ্যে বাদল সরকার তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার কথা বলেছেন বটে, তবে তা কোন দলীয় রাজনীতি নয়। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন তৃতীয় ধারার থিয়েটারের লক্ষ্য নয়। দলীয় রাজনীতির চাপ না থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তৃতীয় ধারার থিয়েটার পরিচালনা করেছেন। সমাজ কীভাবে বদলাবে একথা জানতে চাইলে, তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, ''আমি স্বপ্ন দেখাতে পারি। কী করে পরিবর্তন হবে তা আমার কাজ নয়। পার্টি যাঁরা করে তারা হয়তো জানে।''[৪৮]

তিনি থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদী তথা মানবতাবাদী দর্শনকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি পলিটিক্যাল থিয়েটার করছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''হ্যাঁ করি। কিন্তু পার্টি-পলিটিক্যাল থিয়েটার করি না। আমরা আমাদের পলিটিক্স চেনাই। ব্যাপক অর্থে পলিটিক্স কথাটার মানে হল, একটা দর্শন যা প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে। তার জীবন দর্শনই তার পলিটিক্স। আমরা সেভাবেই নাটকটা করি। এখানে এমন কতগুলো মানুষ একত্রিত হয়েছে যারা বিশেষ কতগুলো বিশ্বাসে একমত হয়েছি। তাদের ব্যক্তিগত ভাবনার রাজনীতি এখানে যৌথ রাজনীতি হয়ে উঠেছে। সেই রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক নাটক করি। সেটা কোনো দলের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে নাও মিলতে পারে।''[৪৯]

আসলে বাদল সরকার ও তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারের কর্মীরা স্বাধীনভাবে একটি স্বতন্ত্র দর্শন তুলে ধরতে চেয়েছেন, যার মূল কথাই হল থিয়েটারের সঙ্গে মানুষের সংযুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন। যে মানুষ এক সময় মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধনেই বিশ্বাসী হয়ে রাজনীতির জগতে গিয়েছিলেন, যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে। তিনি তাঁর থিয়েটারের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই মাধ্যমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘোচানো যায়। এখানেই তৃতীয় থিয়েটারের আসল জোর।

৩

বাদল সরকার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে, আলোচনা সভায় বারবার দাবি করেছেন অভিনব নাট্যশৈলীর অন্বেষণ তৃতীয় থিয়েটারের লক্ষ্য নয়, তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা। বাদল সরকার যতই বলুন নাট্যশৈলীর অন্বেষণ মূল লক্ষ্য নয় কিন্তু থার্ড থিয়েটারের প্রয়োগ পদ্ধতি বাংলা সহভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে সবচেয়ে চর্চিত বিষয়।

তৃতীয় থিয়েটারের নাট্যশৈলী দু'ধরনের মঞ্চব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চারিদিক ঘেরা বদ্ধ ঘরে সীমিত দর্শকের সামনে অঙ্গনমঞ্চ এবং খোলা মাঠে অগুণতি দর্শকের সামনে মুক্তমঞ্চ। বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ সম্পর্কে বলেছেন—

> ''অঙ্গনমঞ্চ' নামটা আমারই দেওয়া। ... আমরা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দোতলার ঘরে যে থিয়েটার শুরু করি তার নাম দিয়েছিলাম অঙ্গনমঞ্চ। তারপর যখন কার্জন পার্কে করেছি তখন আর অঙ্গনমঞ্চ নাম রাখিনি। সেটার কোনো নামই দিইনি। কেউ যদি বলে মুক্ত মঞ্চ, মেনে নেব মুক্তমঞ্চ। আজও যদি ঘরের মধ্যে করি তখন সেটাকে আবার অঙ্গনমঞ্চই বলব।''[৫০]

অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ তৃতীয় থিয়েটারের দু'টি স্বতন্ত্র প্রয়োগক্ষেত্রে। অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় পদ্ধতি প্রচলিত মঞ্চ-ব্যবস্থার মতো নয়। সাধারণত হলের চারটি প্রান্তেই তিনদিকে দেয়াল ঘেঁষে চতুর্থ দিকে একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের কোল ঘেঁষে দুই অথবা তিন সারিতে চেয়ার পাতা, প্ল্যাটফর্মের আড়াল থেকে অভিনেতারা আসা যাওয়া করেন। মাঝখানে পুরো মেঝেটা ফাঁকা পড়ে থাকে অভিনয়ের জন্য। কোন কোন নাটকে আসন বিন্যাসকে অবশ্য একটু পালটে নেওয়া হত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''দর্শক-অভিনয় শিল্পীর যোগাযোগ বিভিন্নভাবে করা যায় নাটকের প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা অনুসারে। দর্শকদের আসনগুলি সরিয়ে সাজিয়ে কখনও অভিনয় ক্ষেত্রের তিনদিকে রাখা যায়, কখনও দু'দিকে, কখনও বা অভিনয় ক্ষেত্র আর দর্শকদের এলাকা পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দর্শকদের সামনে, পাশে পিছনে-সব জায়গাতেই, অভিনয় চলতে পারে।''[৫১]

অঙ্গনমঞ্চের স্বল্প পরিসরে, দর্শকের অত্যন্ত কাছে, কখনো বা দর্শকের মাঝখান থেকে অভিনয় চলে। অঙ্গনমঞ্চে এই যে অভিনয় পদ্ধতি তা তিনি ঠিক করতেন ডায়াগ্রাম এঁকে। এর মধ্যে তিনটি ডায়াগ্রাম তিনি তাঁর 'The Third Theatre' গ্রন্থে উদাহরণ হিসেবে রেখেছেন। যেমন 'মিছিল' নাটকের জন্য বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের যে ডায়াগ্রাম আঁকেন তা এইরকম—

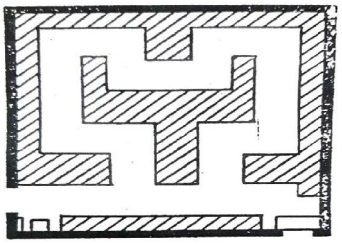

MICHHIL
ANGANMANCHA

অঙ্গনমঞ্চের এই গঠন আকৃতির নাম এরিনা আকৃতি। এরিনার আকৃতি আসলে একটা পরিধি। সেভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু না হলেও করতে করতে যে সাইজটা তাদের উপযুক্ত বলে মনে হয় সেটাতেই তারা করে নিয়েছেন। যখন যেমন জায়গা পান তখন সেটার আয়তন বাড়ে-কমে। এই এরিনাটা হয় রেকট্যাঙ্গেল। এর কারণ অঙ্গন মঞ্চের ঘরগুলি অধিকাংশই রেকট্যাঙ্গেল হয়। তার সঙ্গে জোর করে রাউণ্ড করা অর্থহীন।

মুক্তমঞ্চ বা মাঠ মঞ্চের গঠন আকৃতি একটু আলাদা। মুক্তমঞ্চে রেকট্যাঙ্গেল হয়ে যায় রাউন্ড। বৃত্তাকার অভিনয়স্থলকে ঘিরে চারিদিকে দর্শক বসে থাকে। এ জমি মাপা হয় পা দিয়ে। চারপাশে দর্শক বসে থাকে। যে কোনো দিক থেকেই প্রবেশ পথ তৈরি করা যায়। দর্শকদের পিছন দিয়েও হাঁটার পথ থাকে। অবশ্য বর্তমানে একটি সাদা পর্দাকে পিছনে রেখে বর্গাকার বা আয়তকার একটি অভিনয় স্থলকে তিন দিক থেকে ঘিরে থাকে দর্শক। নিম্নে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় স্থলের গঠনের দুটি নক্সা দেখানো হল—

বৃত্তাকার অভিনয়ক্ষেত্র

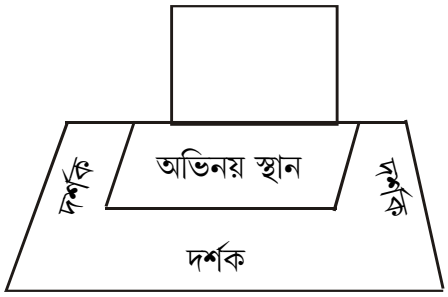

বর্গাকার বা আয়তকার অভিনয়ক্ষেত্র

অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চের নাট্যনির্মাণ এবং নাট্য উপস্থাপনায় ফারাক যাই থাকুক না কেন অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ থার্ড থিয়েটারের এই দুটো প্রয়োগ ক্ষেত্রেই বাদল সরকারের কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘‘আমি ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গনমঞ্চে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। আমি বিশ্বাস করি, এই জায়গাটায় এখনও আরও অনেক কাজ করার আছে। কারণ মাধ্যমটা যোগাযোগের যে তীব্রতা দিতে পারে, খোলা জায়গা থেকে তা পাওয়া যায় না। আবার একই সঙ্গে, যেখানে অনেক মানুষ, আমাদের খোলা জায়গার অনুষ্ঠানগুলো সেখানেই আমাদের নিয়ে যায়। ... আমরা এই দুটোর

কোনওটাকেই ছাড়তে পারি না। ... শিল্পগতভাবে অঙ্গনমঞ্চের প্রযোজনায় আমি বেশি তৃপ্তি পাই, কিন্তু একজন সামাজিক জীব হিসেবে বেশি তৃপ্তি পাই খোলা জায়গার অভিনয়ে।"[৫২]

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটারে অভিনয় পদ্ধতি বাস্তববাদী অভিনয় পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। বাস্তববাদী থিয়েটারে অভিনয় জীবনের অনুকরণ। জীবন যেহেতু দৈনন্দিনতার অঙ্গ সেহেতু বাস্তববাদী অভিনয়ে দৈনন্দিনতা ঘুরে ফিরে আসে। বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এই বাস্তবতার দায় ঘাড় পেতে সহ্য করতে চাননি, বরং বাস্তবতার ঘাড়ে চড়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বাস্তববাদী থিয়েটারে কোনো একটি চরিত্র তার কথা কীভাবে বলবে, কোন সুরে উচ্চারণ করবে, দাঁড়িয়ে না পায়চারি করে না আরাম কেদারায় কাৎ হয়ে— তার মডেল আছে আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে। কিন্তু অন্য রকমের নাটকের কথা কীভাবে বলা হবে তার কোনো অনুকরণযোগ্য মডেল নেই। এখানে ভঙ্গির, কণ্ঠস্বরের, গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার জানিয়েছেন— ''প্রতি কথাকে কি করে সর্বাধিক অর্থবহ করে তোলা যায়, দর্শকের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা যায়— তার অগণিত পদ্ধতির মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নেওয়াই এ নাটকের নাট্যায়নের এবং নাট্যাভিনয়ের মূল কথা।"[৫৩]

এই প্রসঙ্গে 'ভোমা' নাটক থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

''**এক।** (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের এনকোয়রি অফিসের সামনে একটি বৃদ্ধ মরেছে।

দুই। (উঠে) শেয়লদা স্টেশনের বুকস্টলের পেছনে একটি শিশু জন্মেছে।

[সবাই উঠলো]

চার। শেয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরো। চলো দমদম এয়ারপোর্ট — সী ইণ্ডিয়া!

['তিন' মাঝখানে, অন্যরা চক্রাকারে ঘুরছে।]

পাঁচ। গ্রীষ্মে দার্জিলিং, পুজোয় কাশ্মীর, শীতে ওয়ালটেয়ার।

....

পাঁচ। জল ফুটিয়ে খাবেন, না হয় খাবেন শুধু কোকাকোলা।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। সী ইণ্ডিয়া! সী ইণ্ডিয়া! সী ইণ্ডিয়া।"[৫৪]

ভ্রমণের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু যার জন্ম-মৃত্যু শেয়ালদা স্টেশনে, তার কাছে ভ্রমণ বিলাসিতার নামান্তর। শেয়ালদা রেলগাড়ির স্টেশন, কিন্তু নাটকের উপস্থাপনায় এখানে আশ্রয়হীন অনাহারের মুখে চাবুকের মতো আসতে চাইছে, দমদমের রাস্তার নাম, যা ঘটনাচক্রে লোকমুখে এখনো ভি-আই-পি রোড অর্থাৎ সাধারণ মানুষের নয়, অতি বিশিষ্ট জনের। এভাবেই বাদল সরকার

গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা কৌশল। তিনি বলেছেন—

> '' 'শিয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরো'— এই কথা থেকে যদি দ্রুত ঘুরতে থাকে অভিনেতারা চক্রাকারে, এয়ারপোর্ট-কাশ্মীর কোকাকোলার ঘোষণাকে যদি বিশাল রংচঙে সাইনবোর্ডের মতো করে তোলে ভঙ্গীতে, উচ্চারণে এবং শেষে 'সী ইণ্ডিয়া' বলতে বলতে যদি সার্কাসের ঘোড়ার মতো দৌড়োয়, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন রিং-মাস্টারের মতো চাবুক আছড়ায়, তবে হয়তো নাট্যায়নের একটা রূপ পাওয়া যায় যা বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।"[৫৫]

বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতির একটি লক্ষণীয় বিষয় হল কোরাসের অসামান্য ব্যবহার। গ্রিক নাটকে কোরাস ছিল সর্বজ্ঞ। তাদের তাই একক পরিচয় না থাকলেও বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন সফোক্লিসের নাটকে। শেক্সপীয়রের কোরাসও সর্বজ্ঞ। এই ধারণাটি আমাদের ভারতীয় নাটকেও ছিল। সেখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ কোরাস চরিত্র ব্যবহার করেন। আবার করেন বিক্ষিপ্তভাবে গণনাট্যের নাট্যকার ও পরিচালকরা। কিন্তু বাদল সরকারের কোরাস একদম স্বতন্ত্র। তারা কেউ দৈবজ্ঞ নয়। কোরাস তাঁর নাটকে মধ্যস্থতার কাজ করে। একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয়ে বয়ে যায়। যেমন 'ভোমা' নাটকের কোরাস বলে—

> ''পাঁচ। ভোমা ভাত খাবে বাবু।
>
> এক। ভাত? ভোমা?
>
> চার-ছয়। খবরদার স্সালা!
>
> এক। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না ভোমা! তুমি কোথায়?
>
> (চিৎকার করে) ভোমা।
>
> [ভোমা। সাড়া নেই। চার-ছয় ভয়ার্ত, তটস্থ।]
>
> চার। খবরদার স্সালা!
>
> ছয়। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো!
>
> এক। রক্ত?
>
> দুই। মাছের রক্ত।
>
> তিন। মানুষের রক্ত।
>
> সবাই। ঠাণ্ডা আ-আ-। ঠাণ্ডা আ-আ। ঠাণ্ডা আ-আ।"[৫৬]

এখানে একই সঙ্গে একাধিক বিষয় মিশ্রিত হচ্ছে কিন্তু কেউ বেশি কথা বলছে না। একাধিক অস্তিত্ব বয়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরাস ব্যবহারের অসামান্য দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে অদ্রীশ বিশ্বাস

'সাগিনা মাহাতো'র শুঁড়িখানা দৃশ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে যে মূল্যায়ন করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> ''সাগিনা মাহাতো'র শুঁড়িখানা দৃশ্য। ছেদিলাল মদ বেচে। পাহাড়িরা সমবেতভাবে মদ খায়। গান করে। গানটি বিমূর্ত। শব্দময় কিন্তু অর্থহীন। 'চিত্ত' শব্দটিকে বাদলবাবু নূন্যতম তিনমাত্রা এবং সর্বাধিক ন মাত্রায় ব্যবহার করেন। লক্ষণীয় যে বিজোড় মাত্রা। এই দক্ষতা বাদলবাবু '৫৮ সাল থেকে দু'হাত উজার করে লেখা কবিতাবলীতে তৈরি করেছেন। ফলে মাতালের গানে ছন্দবদ্ধভাবে 'চিত্ত-চিত্ত-চি' সুর ও শব্দ মিশে গীত হয়। ছেদিলাল আবার মদ দেয়। ক্রমশ মাত্রা কমে কিন্তু বিজোড়ই থাকে। ৭, ৫ সর্বশেষ ৩ মাত্রা যখন উচ্চারিত হয় তখন সুর নষ্ট, মাতলামোতে বিচ্ছিন্ন ও সঙ্গতিহীন। একটা কোরাস এককে ভেঙে যায়। এভাবেই বাস্তবতাকে দৃশ্য গঠনের প্রয়োজনে অন্যভাবে ব্যবহার করেন বাদলবাবু।''[৫৭]

প্রযোজনার প্রয়োজনে কোরাস বারবার আসে। এভাবেই বাদল সরকার বাস্তববাদী অভিনয় পদ্ধতি অতিক্রম করে গেছেন।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের নাট্যকাহিনির উপস্থাপনা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট কাহিনি উপস্থাপনের চিরাচরিত রীতি থেকে স্বতন্ত্র। সুবৃত্ত নিয়ন্ত্রিত আখ্যানের পরিবর্তে তিনি তাঁর থিয়েটারে কবিতার মন্তাজ এবং ছোট ছোট ঘটনার কোলাজ ব্যবহার করেছেন। 'মন্তাজ' চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ উপস্থাপন পদ্ধতি। মন্তাজ বিষয়টি আসলে গতিশীল। এতে টুকরো টুকরো অনেকগুলি দৃশ্যকে একীভূত করে এমন এক দৃশ্য তৈরি করা হয়, যা টুকরোগুলিতে ছিল না। যেমন একটি চলচ্চিত্রের কোন দৃশ্যে প্রথমে একটি মুমূর্ষু রোগী দেখানো হল, আর একটি জ্বলন্ত প্রদীপ দেখানো হল। পরবর্তী দৃশ্যে রোগী বা জ্বলন্ত প্রদীপ না দেখিয়ে দেখানো হল প্রদীপটি নিভে গেল। পৃথকভাবে রোগীর মৃত্যু দেখানো হলো না। কিন্তু দর্শকের মধ্যে প্রতীতি জন্মাল রোগীর মৃত্যু ঘটল। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক চলচ্চিত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্গেই আইজেনস্টাইন। তিনি দেখিয়েছিলেন ২ x ২ = ৫; অর্থাৎ দুই অন্য একটি দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে চার হয় (২ + ২ =৪), যাকে একালাজ বলে। তাতে দুইটি দুইয়ের অস্তিত্ব অবিকল অটুট থাকে যোগফলের মাধ্যমে। কিন্তু যদি দুটি দুই গুণ করা হয়, তখন সংঘাত রূপের তারা একটি নতুন এক সংখ্যার উদ্ভাবন করে, সেটাই হল মন্তাজের বিশেষত্ব। এই পদ্ধতিকেই বাদল সরকার অন্যরকম ভাবে ব্যবহার তাঁর থিয়েটারে। তিনি থিয়েটারে ব্যবহার করলেন কবিতার মন্তাজ। থিয়েটারে কবিতার মন্তাজ ব্যবহার সম্পর্কে বাদল সরকার

জানিয়েছেন—

> ''যখন কাজটা প্রথম হাতে নিলাম, আমাদের কেউ-ই শব্দটার মানে জানত না। প্রথমে আমরা একটা কবিতা-মন্তাজ করব সিদ্ধান্ত হল, আর তারপর সেটার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কবিতা খুঁজতে শুরু করলাম— ব্যাপারটা এরকম নয়। আসলে কয়েকটা কবিতা আমাদের খুব ভালো লাগল, আমাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে গেল— সেগুলোকে থিয়েটারের মধ্যে এনে ফেলার একটা প্রবল উত্তেজনা বোধ করলাম। আর তাই কবিতা-মন্তাজের আসল মানে কী, সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শবদটা আমাদের কাছে একেবারে যথাযথ মনে হওয়ায় ওটাই আমরা ব্যবহার করতে লাগলাম।''[৫৮]

সাধারণত দু'টি স্তরের মধ্য দিয়ে বাদল সরকার মন্তাজ বিষয়টি তৈরি করতেন। প্রাথমিক স্তরে মিররিং অথবা 'স্লো মোশন-এর মতো কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের অনুশীলন করা হতো। এক্ষেত্রে বাদল সরকার নির্বাচিত কবিতাগুলো পড়ে যেতেন আর অভিনেতারা সেটা শুনে যেত। তাদের শব্দ আর অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো থেকে তাদের তীব্র অনুভূতি স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসত। সেই অনুযায়ী পড়ার ধরনও বদলে যেত। বারবার পড়ার ফলে অসচেতন ভাবেই পঙ্‌ক্তিগুলোর নতুন নতুন উচ্চারণ, শব্দ-সুরের নতুনরকম ওঠানামা, নতুন স্বরভঙ্গি, কখনো বা দীর্ঘ বিরতি— এই সবকিছু অজান্তেই ঘটত। এইভাবে দীর্ঘপ্রস্তুতির পর থিয়েটারের মধ্য দিয়ে দর্শকদের দেখানোর জন্য বাদল সরকার আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন— 'মাইলস্টোন মেথড'। বাদল সরকার বলেছেন—

> ''কবিতাগুলো চূড়ান্ত বাছাই হয়ে গেলে আমরা তার কিছু জায়গার কোরিওগ্রাফি, কিছু পজিশন নির্দিষ্ট করে ফেললাম, মাইলস্টোনের মতো। অভিনয়ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অভিনেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সকলের উপর আস্থা রাখা যায় বলেই দুটো মাইলস্টোনের মাঝখানের অংশটুকু অভিনেতাদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য যুক্ত রাখা হল। 'মারা সাদ' তৈরির সময়ও আমরা এই পদ্ধতি, মানে, 'মাইলস্টোন মেথড' অনুসরণ করেছিলাম।''[৫৯]

বাদল সরকার দু'জন কবির কবিতা দিয়ে মন্তাজ তৈরির কাজটা শুরু করেন। একজন মফস্‌সলের স্কুলশিক্ষক মনিভূষণ ভট্টাচার্য; আর একজন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দু'জনের কেউ-ই প্রাতিষ্ঠানিকতার সাথে সমঝোতা করেননি— আর সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল দু'জনের কবিতার মধ্যেই দারিদ্র্য ও বুভুক্ষ মানুষের জন্য এক গভীর অনুভূতি আর সেই সঙ্গে যারা ওই মানুষগুলোর প্রতি উদাসীন,

যারা ওই দারিদ্র্য আর খিদে তৈরি করে তাদের প্রতি এক ক্ষমাহীন রাগ ব্যক্ত হয়েছে। আর এই কারণেই বাদল সরকার এই দু'জন কবির কবিতা নির্বাচন করেছেন কবিতা মন্তাজ তৈরির জন্য। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন। একটি 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' অন্যটি 'শিশুদের রক্ষা করো'। এই দু'টি কবিতার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

'' 'সম্ভবত, আমি কী বোঝাতে চাই, এতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে!
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে,
ভাত বাড়ে, ভাত খায়!
আর আমরা জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়-সারারাত।'

লু সুন-এর গল্প নিয়ে তাঁর আর একটি কবিতা— 'শিশুদের রক্ষা করো'। সভ্যতার পাঁচহাজার বছর ধরে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে আছে। কবিতাটি একেবারে শেষে এক গভীর আবেদন:

'শিশুদের রক্ষা করো
যেসব শিশু এখনও মায়ের বুকের দুধ খায়,
যাদের ভাতের সঙ্গে এখনও নরমাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়নি
রক্ষা করো
যেন তারা মানুষের মাংস না খায়।'

এই ধরনের সব কবিতাই মন্তাজ তৈরি করতে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছি।''[৬০]

এই প্রেরণাই তাঁকে 'জন্মভূমি আজ' নাটকটি লিখতে উৎসাহিত করেছে। ১৯৮৬ সালে নির্মিত এই নাটক প্রকৃতপক্ষে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য এবং বাদল সরকারের নিজের লেখা কবিতার মন্তাজ।

বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে মন্তাজ ব্যবহার করলেও তিনি মূলত কোলাজ পদ্ধতিরই সফল ব্যবহারী। একমাত্র ১৯৯০ সালে নির্মিত 'পদ্মানদীর মাঝি' নাটক ছাড়া এমন কোন নাট্যকর্ম নেই যেখানে তিনি পদ্ধতিগত ভাবে কোলাজের সঙ্গে মন্তাজকে এক করতে পেরেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র অথচ আটোসাঁটো উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'। তাকে নাট্যরূপ দিয়েছেন বাদল সরকার। এখানে তিনি কোলাজের সঙ্গে মন্তাজের সফল প্রয়োগ করেছেন। বহু দৃশ্য একাকার হচ্ছে কোলাজ পদ্ধতিতে। এখানে একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রী ঘুরে ফিরে কুবের, কপিলা, মালা চরিত্রে

অভিনয় করে। আর আছে ন্যারেশন। কথকের মত করে বইটি পড়ে যাওয়া হয়। ঘুরে ফিরে আসে চরিত্রেরা। এর মাঝে একটিমাত্র সাদা কাপড় পুরো নাটকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যবহার করা হয়। কাপড়টি কখনোই হাতছাড়া হয় না। ফলে মন্তাজরীতিতে এই কাপড়টিই ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে অদ্রীশ বিশ্বাস লিখেছেন—

> ''একটি দৃশ্যে কাপড় ছিল জলের ঢেউ, সেটাই যখন নৌকার পাল কিংবা জেলে পাড়ার ঘর, বস্তি অথবা পুটুলি হয়ে যায়, তখন তার বদল প্রক্রিয়ার আড়ালে চরিত্ররাও নিজেদের পরিচয় বদলে ফেলে। এভাবেই দুটি রীতি মিলে যায় এ নাটকে— যার নাম দেন বাদলবাবু– 'শ্রুতি আলেখ্যে'।''[৬১]

কাপড় কখনো ধুতি, কখনো দড়ি, কখনো লাঠি ব্যবহার করে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যান বাদল সরকার। তাঁর মিশ্রণ কৌশলের অঙ্গ এই অনুষঙ্গগুলি। এগুলিকে বাদল সরকার বলেছেন ম্যাজিক্যাল প্রপট্স। কারণ, যেভাবে জাদুকর লোককে জাদু দেখায় হাতে এই রকম কিছু নিয়ে এবং একটা অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করতে জাদুকর হাতের ওই লাঠি প্রপটস্টি ছোঁয়ায়, তখনই ম্যাজিক হয়ে বদলে যায়। একে বলে ম্যাজিক্যাল মেথড। বাদল সরকার 'পদ্মানদীর মাঝি' নাটক ছাড়াও বহু নাটকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন 'পাণ্ডবাণী'তে হাতে থাকে এরকমই একটি বীণা, ঘুঙুর, লাঠি কিংবা চামর। দৃশ্য বর্ণনার পরিবর্তনে পাণ্ডবাণী গায়ক এগুলি ব্যবহার করে। বাদল সরকার একইভাবে 'ভুল রাস্তা' নাটকাভিনয়ে একটি রুমাল ব্যবহার করেন। অসাধারণ, সেই রুমালের ব্যবহার। যেমন, 'সাদাকালো' নাটকে দড়ি ও 'দখল' নাটকে ফিতের ব্যবহার।

একই পদ্ধতিতে বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে শব্দ ও সুরকেও ব্যবহার করেছেন। শব্দ তাঁর নাটকে তীব্র হৃদয় সঞ্চারী। তা কোনো বস্তুর শব্দ অথবা মুখ নিঃসৃত শব্দ, যাইই হোক। যেমন 'খাট্মাট্ ক্রিং' কিংবা 'ত্রিংশ শতাব্দী'তে লাঠি বাজানোর শব্দ ব্যবহার করেন। 'চড়ুইভাতি'তে বাচ্ছাদের কটকটি বাজনার শব্দ যুদ্ধের শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কোরাস একক কিংবা সমবেতভাবে জলের শব্দ, বাঁধ ভাঙার শব্দ, ব্যাণ্ড পার্টির শব্দ, পাখির কলকাকলি, মেশিনের আওয়াজ, ফেরিওয়ালা অধ্যুষিত স্টেশন ও নির্জন রাত গড়ে তোলার কৌশল সত্যিই অভাবনীয়। এসবই বাদল সরকার প্রয়োজনে দৃশ্যান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন আবার দৃশ্য নির্মাণেও ব্যবহার করেন। এগুলির মধ্যে দিয়েই তিনি প্রপট্সের বিকল্প খুঁজে নিয়েছেন। এগুলি নিছক চমক বা কৌশল মাত্র নয়। বাদল সরকার যে অর্থে ফ্রি থিয়েটারের দিকে যেতে চান, সেই অর্থে ফ্রি থিয়েটার গড়ে তুলতে তিনি, থিয়েটারকে অনাড়ম্বর করে তুলেছেন এসবের মধ্য দিয়ে। আসলে তিনি ব্যায়কে বর্জন করে আরো সহজ কিছু গ্রহণ করেছেন। কারণ, গ্রহণই তৃতীয় থিয়েটারের

প্রধান কথা। এভাবেই বাদল সরকার থিয়েটার তত্ত্বে, নাট্যরচনায়, প্রযোজনা কৌশলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয় থিয়েটারের কলাকুশলীরা প্রথাগত থিয়েটারের মতো মেক-আপ করে অভিনয় করেন না, তারা অভিনয় করেন সাদামাটা পোশাকে, চরিত্রের নিখুঁত সজ্জায় নয়, অভিনেতার ব্যক্তিগত রূপসজ্জাতেই অধিকাংশ সময়ে, কোন কোন সময় সামান্য দু'একটি বহিরাগত সাহায্য নেওয়া হয়, কোন বিশেষ চরিত্রকে আভাসিত করার জন্য। কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে এখানে অভিনয় গড়ে ওঠে না, কোন চরিত্র বিশেষকে নিয়েও নয়; মুহূর্মুহু অভিনেতা চরিত্র থেকে চরিত্রে সঞ্চারণ করেন। অর্থাৎ দৃশ্যান্তরে চরিত্রের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

বাদল সরকার তার থিয়েটারে অনেক সময় পুরুষ চরিত্রে নারীদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। চরিত্রকে দর্শকের বোঝবার জন্য কাপড়ের টুকরোতে 'রাজা', 'মন্ত্রী', 'রাজপুত্র'-এইসব লিখে অভিনেতাদের পিঠে জামার গায়ে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিতেন। যে অভিনেতা ছোট ছোট অনেকগুলো চরিত্রে অভিনয় করতো তার জন্যে লেখা হত 'বার্তাবহ', 'রক্ষী' ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতেই করা হয় ছোটদের একটি নাটক 'রূপকথার কেলেঙ্কারী'। যেখানে রাজপুত্র চরিত্রে অভিনয় করেছেন একজন মহিলা। তাঁর পিঠে জামার গায়ে 'রাজপুত্র' লেখা পিন দিয়ে লাগিয়ে তাকে অভিনয়ে নামানো হয়। এমনকি সংলাপও বলতেন নিজের স্বাভাবিক গলার স্বরেই। পরবর্তীকালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুরবা'ও ঐ একইভাবে অভিনীত হয়। এখানেও অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্রে একজন মহিলাকে নির্বাচন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের অভিমত হল—

> ''যেহেতু নাটকটা স্বভাববাদী নয়, তাই একজন মহিলা একটা কাল্পনিক জাহাজের ভাইস-ক্যাপ্টেন হতেই পারেন। যাই হোক, কোনও চমক বা কায়দা দেখানোর জন্য নয়, দলের বিভিন্ন সদস্যের অভিনয় ক্ষমতার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও দর্শকরা কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেননি।''[৬২]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে দর্শক-অভিনেতা একাকার হয়ে যান। বাদল সরকারের কাছে দর্শক কেবল উপভোক্তা নয়, তারাও নাটকের সঙ্গে অঙ্গীভূত। দর্শকের ভেতর থেকেও উঠে আসবে অভিনেতা। তাই তিনি কেবল স্পেস শেয়ার করেই থামেননি, দর্শককে সমন্বিত করেন তাঁর নাটকে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মিছিল' নাটকটি। এই নাটকে এক পথের অন্বেষণ রয়েছে, যে পথে এক সত্য ঠিকানায় পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে সত্যি বাড়ি। সে তো স্বপ্নের পথ। তাই সেখানে স্পষ্ট ভাষা থাকে না, শেষে একটি সুর বাজে, যা জীবনের সুর। সেই সুর কণ্ঠে নিয়ে হাত ধরাধরি

করে তারা যায় সেই অন্বিষ্ট পথে এবং ক্রমশ দর্শকের হাত ধরতে থাকেন অভিনেতারাও। তারাও উঠে মিছিলে যোগ দেন। তখন সে মিছিল নাটকের মিছিল হয় না, তা হয়ে উঠে মানুষের। যে পথ রচিত হয় সে পথ মানুষের যাত্রাপথ, মানবিক পথ। অন্যান্য অনেক নাটকেও এমন অনেক প্রশ্ন করা হয় যা কিনা দর্শকের জন্যই। 'ভুলরাস্তা' নাটকে তো দর্শকরাই সেই গল্প শোনার শ্রোতা অর্থাৎ নাটকের অংশ। নাটকের একটি চরিত্র কিছু মানুষের গল্প শোনাচ্ছে। সেই শ্রোতারা নাটকেরই চরিত্র। সেই চরিত্রে অভিনেতারা আসেন না, সেই স্থানটি নেয় দর্শকরা। এইভাবে দর্শক-অভিনেতা একাকার হয়ে যায় এই তৃতীয় ধারার থিয়েটারে।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সূত্রধার। এই সূত্রধার আসলে লেখকেরই প্রতিনিধি অথবা প্রকারান্তরে গোটা নাট্যদলের— সে গল্প বলিয়ে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের সংযোগকারী অথবা উপস্থাপনার ব্যাখ্যাকার। তবে সূত্রধার কিন্তু নাট্যকারের প্রোটোটাইপ নয়। আর সে কারণেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে সূত্রধার এক নয়, একাধিক। একাধিক সূত্রধার দৃশ্য-স্থান-সময় পরিবর্তন ঘোষণা ছাড়াও নানা মন্তব্য করেন যা দর্শককে নাটকের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে। 'গণ্ডী' নাটকের মুখবন্ধ-এ বাদল সরকার সূত্রধারের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''একটি কথা— যাঁরা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁদেরই বিভিন্ন সূত্রাধারের ভূমিকা নেওয়া উচিত; কোনো ক্ষেত্রেই কেনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেন বিশেষ করে সূত্রাধারের ভূমিকায় নির্দিষ্ট না থাকেন। এবং এ নাটকে সূত্রধাররা নাটকের অঙ্গীভূত, বিচ্ছিন্ন ঘোষকের ভূমিকা নয় তাদের।
>
> সূত্রাধারদের প্রতিটি কথার অর্থ দর্শকের উপলব্ধিতে না পৌঁছোলে নাটকটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।''[৬৩]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে একারণেই সূত্রাধারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের শরীরী অভিনয় দিয়ে তৈরি করা হয় নানান প্রতীক। মঞ্চসজ্জার যাবতীয় অভাব পূরণ করা হয় তাদের শরীরী প্রকাশ ভঙ্গির সাহায্যে। এক্ষেত্রে 'গণ্ডী' নাটকের কয়েকটি মঞ্চ নির্দেশনার উল্লেখ করা যেতে পারে—

১. সূত্রধাররা নদী আর ভাঙ্গা পোল তৈরী করেছে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক আঁকশি দিয়ে যে দড়ি ধরবার চেষ্টা করছে।

২. ঝরণা পার হয়ে চলে গেছে সোমা। সূত্রধাররা এখন পাহাড়ে পথ, পাথর, গাছ, উঁচু- নীচু রাস্তা।

৩. সূত্রধাররা এসে সারি দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নদী হলো। ছড়ানো বাহু দুলছে ঢেউয়ের

মতো।

৪. সুমন পড়ে আছে, সূত্রধাররা তাকে ঘিরে এমনভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করছে যেন তারাই আগুনের আঁচ, বরফ-হাওয়া, খিদে।

এইভাবে সূত্রধার তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতি প্রধানত ওয়ার্কশপ ভিত্তিক। ওয়ার্কশপ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই নাট্যনির্মাণ, তৃতীয় থিয়েটারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতি শুরু হয়েছিল 'স্পার্টাকুস' নাটকের অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় প্রস্তুতির সময়। বাদল সরকার তখন নতুন এক অঙ্গনমঞ্চের জন্য নতুন এক পথের সন্ধান করছিলেন। 'স্পার্টাকুস' নাটকের অভিনয়ের প্রস্তুতি করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন এক নতুন নাট্য প্রয়োগরীতির সন্ধান। যাকে বাদল সরকার বলেছেন— 'ওয়ার্কশপ' বা কর্মশালা পদ্ধতি। তিনি লিখেছেন—

> ''সেটা একটা বিশেষ সময়। কারণ একটা নাটকের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আসলে কোনও একটা নতুন পথের খোঁজ চলছিল, আর সেইসঙ্গে এক নতুন প্রয়োগরীতিও বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরা একে 'ওয়ার্কশপ' বা কর্মশালা পদ্ধতি বলি।''[৬৪]

বাদল সরকারের থিয়েটার বিষয়প্রধান, তাই নাটকের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একাত্ম হতে হয়। এটা একজন নাট্যকার লিখেছেন আর একজন পরিচালক দাবার ঘুঁটির মতো করে অভিনেতাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন এমন নয়। প্রত্যেককে বিষয়টা গ্রহণ করতে হয়। বাদল সরকার একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''... Content based theatre হওয়া মানে খালি পরিচালক নয়, খালি নাট্যকার নয়, Group-এর সমস্ত সদস্য অন্তত একটা Common বিশ্বাসের জায়গায় আসবে তো, সাধারণ বিশ্বাসের জায়গা, যে নাটকটা করছে তার বিষয়ে বস্তুর সঙ্গে তাদের একটা আত্মীয়তা থাকবে তো, তবে তো করতে চাইবে তারা, বুঝবে তারা। করা দরকার বলে মনে করবে তারা। তা না হলে তো হচ্ছে না। সেখানে কিন্তু production notes দিয়ে চলে না, আরো বেশি Involvement, আরো বেশি contribution দরকার এবং সেখানে work-shop process-টা প্রচণ্ড সাহায্য করে...;''[৬৫]

প্রাথমিক ভাবে আমাদের মনে হতে পারে বাদল সরকারের থিয়েটারের নাট্য ওয়ার্কশপ আসলে থিয়েটার শিক্ষণ পদ্ধতি। হয়তো ঠিক তাই, কিন্তু সবটা তা নয়। এই নাট্য ওয়ার্কশপ পদ্ধতিটা

একজন নাট্যকর্মীর খানিকটা নিজেকে চেনার ব্যাপার। নিজেকে চেনা মানে নিজের সৃজন শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। একজন নাট্যকর্মীর নিজের শরীরের কী কী সম্ভাবনা আছে তার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''শরীর বলতে পুরো শরীর হাত-পা নাড়া নয় কারণ naturalistic theatre-এর বাইরে আমরা চলে এসেছি তাই পুরো শরীরটা, মানে শিরদাঁড়াটাকেও ব্যবহার করা যায় যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আমরা ব্যবহার করি, এই অবহিত হওয়া, এবং নিজের চিন্তা এবং অনুভূতি তার সঙ্গে শরীরের মাধ্যমের প্রকাশ-এর সম্পর্কটা কি— এই সম্পর্ক স্থাপন করা। এই হচ্ছে work-shop-এর পদ্ধতি, বুঝতেই পারছেন, আমাদের থিয়েটারে এটা একেবারে অবশ্য কর্তব্য, এই link-টা না করলে পারি না, ...।''[৬৬]

বাদল সরকার তাঁর থিয়েটার নাট্যওয়ার্কশপের যে পদ্ধতি নিয়ে এসেছেন সেটা তিনি নানা অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন রিচার্ড শেখনারের। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

> ''প্রথম শিখেছি বেশ খানিকটা রিচার্ড শেখনারের (জন্ম: ১৯৩৪) কাছ থেকে। তার দলের সঙ্গে কাজ করে গ্রুপ এক্সারসাইজগুলো শিখি, ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করি, সেখান থেকেই প্রসেসটা আরম্ভ হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে যখন আমেরিকায় যাই তখন দু'মাস ওদের দলের সঙ্গে কাজ করি। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আমি আরম্ভ করি।''[৬৭]

রিচার্ড শেখনারের কাছ থেকে ওয়ার্কশপ-এর ধারণাটা রপ্ত করার পাশাপাশি আরো বহু জনের কাছ থেকে বাদল ওয়ার্কশপ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন। এক্ষেত্রে আরো দু'জন ব্যক্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। একজন কারনেল পেটারনেস্টো, আর একজন জন ক্যাসেন নামে এক ইংরেজ যুবক। তাঁদের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—

> ''কারনেল পেটারনেস্টো নামে এক ব্রেজিলিয়ান ডান্সার এসেছিলেন। তার নাচের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের ভীষণ মিল আছে। সে 'ডান্স থিয়েটার' করে। সে আমাদের ওয়ার্কশপ করে, আমরা তার একটা ওয়ার্কশপ করি। আমি স্বীকার করি তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি বলে, ...। জন ক্যাসেন নামে এক ইংরেজ ছোকরা এসেছিল, তার কাছ থেকে দু'একটা খুব ভাল ওয়ার্কশপ আইটেম পেয়েছি যা আমাদের কাজে লেগেছে।''[৬৮]

ওয়ার্কশপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এইসব মানুষজনের কাছ থেকে গ্রহণ করলেও বাদল সরকার তাঁর ওয়ার্কশপের মেথডোলজি তৈরি করেছেন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে। নিজের দল এবং দলের বাইরে করতে করতে তাঁর ওয়ার্কশপের একটা মেথডোলজি তৈরি হয়। কোন বদ্ধ পদ্ধতি নয়, সেটাও মুক্ত। নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে নয়। বাদল সরকার বলেছেন—

> ''রিজিড প্ল্যান থাকলে, এইটাই করাব জোর করে, ওয়ার্কশপ হয় না। ... আগের অনেক আইটেম বাদ গেছে, নতুন আইটেম এসেছে, তার কিছু অন্যের কাছে শিখেছি, কিছু আমি নিজে উদ্ভাবন করেছি। করে একটা প্রসেস এসেছে।''[৬৯]

অর্থাৎ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত এই পদ্ধতি ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়। প্রথমে তিনি তাঁর দলের কাজের মধ্যে এর সূচনা করলেও পরে থিয়েটার ও থিয়েটারের বাইরের লোকদের নিয়ে তিনি যেসব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়েছে।

বাদল সরকারের ওয়ার্কশপের ধরণও স্বতন্ত্র। তাঁর প্রবর্তিত ওয়ার্কশপে কোন প্রতিযোগিতার স্থান নেই; নেই কোন পর্যবেক্ষক বা অবজার্ভার-এর স্থান। কারণ তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> ''কারণ আমি পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছি তো! যে সব মুখোশ পরেছি, সেগুলোকে আস্তে আস্তে বার করছি, যাতে ইনহিবিশনটা কাটে। থিয়েটারের সব থেকে বড় শত্রু তো ইনহিবিশন।''[৭০]

বাদল সরকার তাঁর ওয়ার্কশপে কিছু এক্সটারনাল এবং কিছু ইন্টারনাল এই দু'ধরনের অনুশীলন করাতেন। এক্সটারনাল অনুশীলনে প্রথমে কিছু কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করিয়ে নেওয়া হয়। এই ব্যায়ামগুলোর উদ্দেশ্যই থাকে কিছু আকর্ষণীয় খেলার মাধ্যমে একজনকে নাটকীয় অভিব্যক্তির মানসিক বাধা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করা। সেই সঙ্গে নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হতে, নিজেরই শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করা। এছাড়া শারীরিক ও মানসিকভাবে পারস্পরিক বিশ্বাস বাড়ানো, চলাফেরার মধ্য দিয়ে অভিনয় ক্ষেত্র ও অন্যসব কিছুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল রপ্ত করা, একা ও দলগতভাবে শব্দগতি ও ছন্দ আবিষ্কার বাড়ানোর কৌশল রপ্ত করা এবং নিজের সৃষ্টিশীল দক্ষতাকে বের করে এনে ঠিক পথে চালিত করা আর সর্বোপরি সমষ্টিগত ও দলগত ঐক্যবোধের এক গভীর চেতনার জন্ম দিতে সাহায্য করাই হল এই এক্সারসাইজগুলির মূল উদ্দেশ্য। এগুলোকে বাদল সরকার বলেছেন এক্সটারনাল ওয়ার্কশপের— অনুশীলন। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বিভিন্ন খেলার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। খেলাগুলো

এমনভাবে সাজান থাকে, একটার সঙ্গে একটা জড়িত হয়ে হয়ে একটা জায়গায় পৌঁছায়। বাদল সরকারের নাট্যদল শতাব্দীর দীর্ঘ পনেরো বছরের নাট্যকর্মী তাপস মুখোপাধ্যায় এই জাতীয় কিছু থিয়েটার গেমের কথা বলেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

> ''এই ধরনের একটা প্রাথমিক খেলা হল, 'নেমগেম'। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কোনো একটা বাজনা বাজানো হয়। কিছু মানুষ সেখানে ঘুরতে থাকে এলোমেলোভাবে। হঠাৎ বাজনা থেমে গেলে বিচ্ছিন্ন সকলে 'পেয়ার' খুঁজে নিয়ে হাত ধরাধরি করে নিজের নাম, ধাম পরিচয় বলতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওটা বলতে হয়। তারপর আবার বাজনা শুরু হয়। আবার এলোমেলো ঘোরাঘুরি করা। আবার বাজনা থামলে অন্য কোনো 'পেয়ার' তৈরি করে পরিচয় দান। এভাবে হৈহট্টোগোলের মাধ্যমে অদ্ভুত একটা খেলা হয়।''[৭১]

এরকম নানা খেলার মধ্য দিয়ে নাট্যওয়ার্কশপের প্রাথমিক অনুশীলন চলে। পরের ধাপ হল নাটকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খেলার মধ্যে দিয়ে মনকে নাটকের ভেতরে নিয়ে আসা। অর্থাৎ মন-শরীরের সম্পর্ক তৈরি করার অনুশীলন হয় এই পর্বে। এই জায়গায় থেকে কর্মশালা-অনুশীলনী ক্রমশ হয়ে ওঠে ইন্টারনাল। এই পদ্ধতির কার্যকারিতার কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একজন অন্যের অনুভূতিকে, শরীরের মাধ্যমে, মুভমেন্ট-শব্দ-ছন্দ- এনার্জি ও ভাষার মাধ্যমে স্পর্শ করার বিভিন্ন পথ ক্রমশ আবিষ্কার করতে পারে।''[৭২]

তাপস মুখোপাধ্যায় ওয়ার্কশপের কিছু ইন্টারনাল গেমের কথা বলেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''যেমন, একটা বেলুন দিয়ে বলা হয়, সবাই যেন এটাকে মাটিতে পরতে না দেয়। তা, সবাই তখন ওই বেলুনটাকে উঁচুতে রাখতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; দৌড়ে এসে বেলুনে টোকা মারে— এভাবে একটা ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়। বাদলদা তখন থামিয়ে দেন, বলেন, 'সবাই মিলে যৌথভাবে চেষ্টা করুন। ধাক্কাধাক্কি করবেন না আর, অন্যকে বিশ্বাস করুন। যখন যার কাছে বেলুন যাচ্ছে তখন তাকেই টোকাটা মারতে দিন।' আবার শুরু হয়। তখন সবাই স্বাভাবিকভাবেই ঘুরছে, বেলুন ও বাঁচাচ্ছে, কেউ ধাক্কাধাক্কি করছে না। অথবা, বাদলদা কোনো একজনকে মাঝখানে চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনাকে বিভিন্ন

দিকে ফেলে দেওয়া হবে। আপনি পড়ে যাবেন।' তাকে বাঁচাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেতারা। যে ভয় পায়, তার পা ভেঙে যায়। বাদলদা, ভয় দূর করতে এই খেলাটা খেলান। এতে দলের অন্যদের প্রতি আস্থা তৈরি হয়।"[৭৩]

আরো নানা ধরনের ইন্টারনাল গেম চলে এই পর্বে। এরকম আর একটি খেলা দলের প্রত্যেককে আলাদাভাবে যে কোনও একটি তাল ও লয়ে মুখে শব্দ করতে বলা হত এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক ভঙ্গি করে ঘরের এক কোন থেকে আরেক কোনায় যেতে বলা হত। শর্ত হচ্ছে শব্দ ও শরীরের ভঙ্গিকে একই তাল ও ছন্দে মেলাতেই হবে। এইসব ইন্টারনাল গেমের মাধ্যমে চলে নাটকের বিষয় ও সংলাপ নিয়ে নানা খেলা। কিন্তু তাতে কোনও নির্দিষ্ট কোরিওগ্রাফির জন্ম দেয় না, বরং নাটকের বিষয়টি একজন নাট্যকর্মীর রক্তে গেঁথে দিতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে একজন নাট্যকর্মীর অন্তরের শক্তিকে, তার অনুভূতির তীব্রতাকে, নাটকের সমস্ত অভিনেতার পারস্পরিক সম্পর্ককে টেনে বের করে আনে। আর সেটা থেকেই একটা চূড়ান্ত কোরিওগ্রাফি তৈরি হয়ে যায়, যা একজন কোন পরিচালকের নয় একটি দলের সমবেত অংশগ্রহণের ফল— বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়। তাপস মুখোপাধ্যায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তাই লিখেছেন—

> ''কিছু কিছু গেম আছে, যেগুলো এক্সটারনাল হলেও তার সঙ্গে মানসিক যোগ থেকেই যায়। যেমন, 'স্লো মোশান' সিনেমায় যেমন ধীর গতিতে ছবি চলে, তেমনি, ওয়ার্কশপেও ধীর গতিতে হাঁটতে হয়। এতে মনের উপর ভীষণ প্রভাব তৈরি হয়। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ, পেশীর চাপ আমরা বুঝতে পারি, এভাবেই প্রভাবটা তৈরি হয়। এই ইন্টারনাল গেমগুলোর মধ্যে দিয়ে মনের মধ্যেকার বিভিন্ন ইমোশনগুলোকে বের করে আনা। বের করে আনা ঠিক নয়, এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে আসে। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে কিছু কিছু 'বদ্ধতা' থাকে। সেই বদ্ধতা ভেঙে মানুষটাকে বের করে আনাই এই ওয়ার্কশপগুলোর উদ্দেশ্য।"[৭৪]

বাদল সরকার যে ধরনের বিষয় নিয়ে থিয়েটার চর্চা করেন, সেখানে অভিনেতাদের চিন্তা ও অনুভূতিই হল একমাত্র মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়। শুধু দক্ষতা আর কায়দা দিয়ে অভিনয় করা নয়, প্রত্যেক অভিনেতাকে বিষয়বস্তুর সাথে একাত্ম হতে হয় এবং তা থেকে উৎসারিত আবেগ প্রতিফলিত হয় নাটকের বিষয়ে। বাদল সরকার এই ধরনের অভিনয় রীতিকেই বলেছেন ''স্টেট অর্ফ বিয়িং' দিয়ে অভিনয়।"[৭৫] তিনি বলেছেন—

> ''নিয়মানুগ অভিনয় বা 'এনঅ্যাক্টমেন্ট' আমরা চাই না। আত্মসচেতনতা ও

আত্মবোধ দিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বুঝতে পারা, নিজের অন্তরের গভীরতাকে ছুঁতে পারা, আর সেই স্তরে পৌঁছে অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা— এইসবই একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, ...।"[৭৬]

বাদল সরকার তাঁর নাট্যওয়ার্কশপে সেই অভিনয় রীতিরই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আর সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে তৃতীয় থিয়েটার এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক।

৪

এখন প্রশ্ন হল বাদল সরকার তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য আঙ্গিকের স্বরূপটা কী? তিনি যে নাট্য আঙ্গিকের উদ্ভাবন করেছেন সেটা কী একেবারেই নতুন কিছু? বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিক, প্রয়োগশৈলীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের নানা নাট্য আঙ্গিকের। আলোচনার এই পর্বে আমরা বাদল সরকারের থিয়েটারের স্বরূপ কী? কোন কোন থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর থার্ড থিয়েটারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং কোথায় নতুনত্ব সেই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিদেশি যেসব নাট্যআঙ্গিকের সঙ্গে বাদল সরকারের থিয়েটারের মিল রয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পোল্যাণ্ডের গ্রোটস্কির (Grotowski) 'পুওর থিয়েটার'-এর। ১৯৫৯ সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পোল্যান্ডের ওপোলে শহরে গ্রোটোস্কি প্রতিষ্ঠা করেন 'থিয়েটার ল্যাবরেটরি'। তারপর ষাটের দশকের প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তাজগতে যে আলোড়ন শুরু হয় তাঁরই ফল 'পুওর থিয়েটার'। তাঁর চিন্তাভাবনাসমূহ নিয়ে যে গ্রন্থ তার নাম 'Towards a Poor Theatre'। তাঁর থিয়েটারের তিনি নাম দিয়েছিলেন— 'Poor Theatre'। গ্রোটস্কি তাঁর থিয়েটারের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন—

" We are seeking to define what is distinctively theatre, what separates this activity from other categories of persormance and spectacle. Secondly, our productions are detailed investigation of the actor-auidence relationship. That is, **we consider the personal and scenic technique of the actor as the core of theatre art.**"[৭৭]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে অভিনেতা-দর্শকের সংযোগের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

গ্রোটোস্কি মনে করেন দর্শকও অভিনয়েরই অংশ। তাদেরকে অভিনয়ে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন তিনি। গ্রোটোস্কি বলেন—

"We have risigned from the stage-and-auditorium plant: for each

production, a new space is designed for the actors can play among the spectators, directly contacting the audience and giving it a passive role in the drama (e.g.our productions of Byron's **Cain** and Kalidasa's **Shakuntala**). Or the actors may build structures among the spectators and thus include them in the architecture of action, subjecting them to a sense of the pressure and congestion and limitation of space (Wyspianski's **Akropolis**) That simply creates a bare laboratory situation, an appropriate area for investigation. The essential concen is finding the proper spectator-actor relationship for each type of performance and embodying the decision in physical arrangements."[৭৮]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে তো এই কথাই বলা হয়েছে। দর্শক কেবল উপভোক্তা নয়, তারাও নাটকেরই অংশ— এই কথাই বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে বলেছেন। গ্রোটোস্কি মনে করেন অভিনয় হবে সহজাত। তিনি বলেছেন অভিনেতাদের তিনি পূর্ব নির্ধারিত কিছু কৌশল শেখাতে চান না। চাতুরী দিয়ে দর্শককে ভোলানোর পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। যে কারণে তিনি বলেছেন—

"We do not want to teach the actor a predetermined set of skills or give him a 'bag of tricks' ours in not a deductive method of collecting skills. ... The actor makes a total gift of himself. This is a technique of the 'trance' and of the integration of all the actor's psychic and bodily powers which emerge from the most intimate layers of his being and his instinct, springing forth in a sort of translumination."[৭৯]

গ্রোটোস্কির মতো বাদল সরকারও মানুষের ভেতরকার মানুষটাকে বের করে আনতে চেয়েছেন। 'থিয়েটারে মুখোশ' প্রবন্ধে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

"... রামের ভিতরে একটা স্বভাব আছে, রামের একটা স্বাভাবিক সত্তা আছে। নাটকের চরিত্র শ্যামেরও থাকার কথা। আসল বাস্তব-সেই সত্তা। সেই ভিতরের সত্তাকে টেনে বের করে থিয়েটার করতে পারলে হয়তো সত্যিকারের বাস্তবধর্মী

থিয়েটার হোত।”[৮০]

গ্রোটোস্কি তাঁর নাট্যচর্চায় অভিনেতার শরীরী অভিনয়ের উপরই জোর দিয়েছিলেন। অভিনেতার শরীর প্রকাশের উপরই নির্ভর করেছেন তাঁর সমগ্র নাট্যপ্রযোজনায়। এতোদিন ধরে নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, সেই মঞ্চসজ্জা, আলো, দৃশ্য সজ্জা অর্থাৎ থিয়েটারের যাবতীয় আড়ম্বরকে তিনি বর্জন করেন। এগুলির চাইতে তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীর-এবং তাদের শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি তাঁর নাট্যবস্তুকে দর্শকের কাছে হাজির করতে চেয়েছেন। এই জন্য গ্রোটোস্কি তাঁর দীর্ঘ কর্মশালার আয়োজন করেন। মানুষের যে মুখোশটা সেটা খুলে আসল মানুষের সন্ধান করেন। আর এটা নির্মাণ করেন দীর্ঘ ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে। বাদল সরকারও তাঁর ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে সেই মুখোশ খুলে আসল মানুষকে বের করার চেষ্টা করেছেন। থিয়েটারের শরীর থেকে তিনিও গ্রোটোস্কির মতো কেড়ে নিয়েছেন যাবতীয় আভরণ। সাজ-পোশাক, আলো-আঁধারি খেলা, মায়া সৃষ্টি করার যাবতীয় কৌশল তিনি ত্যাগ করেছেন। উভয়েই এইসব বাহুল্যকে বর্জন করেছেন প্রসেনিয়ামের সমালোচনা করে। বাদল সরকার যেমন প্রসেনিয়ামের বিস্তর বাধার উল্লেখ করেছেন, তেমনি বাহুল্য বিষয়ে গ্রোটোস্কিও থিয়েটারের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তিনি বলেন—

“We have resigned from the stage-and-auditorium plant.”[৮১]

থিয়েটারের যাবতীয় উপাদানের বাহুল্য বর্জন করার কারণে অভিনয়ের যাবতীয় জোর গিয়ে পড়ে দৈহিক ও বাচনিকভাষার উপর। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রোটোস্কি আশ্রয় নিয়েছেন দর্শকের কল্পনা শক্তির উপর। গ্রোটোস্কি দর্শকের কল্পনাশক্তি, সৃজন শক্তির ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন—

“The theatre is also an encounter between creative people.”[৮২]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারেও এই দর্শকের কল্পনাশক্তির উপর গভীর আস্থার কথা বলা হয়েছে। এই জোরে তিনি তাঁর থিয়েটারকে করে তুলেছেন ফ্লেক্সিবল।

১৯৬৯ সালে যখন বাদল সরকার ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম সূত্রে পোল্যাণ্ড গিয়েছিলেন তখন তিনি গ্রোটোস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর কাজ দেখেন। সেই সূত্রেই দু'জনের মধ্যে থিয়েটার সংক্রান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান ঘটে। হয়তো এই কারণেই বাদল সরকারের থিয়েটারে গ্রোটোস্কির থিয়েটারের একটা প্রভাব পড়েছে বলে আমাদের মনে হয়। বাদল সরকার শ্রীরাম মেমোরিয়াল লেকচার, ১৯৯২-তে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

“There are certain things he has said which I liked very much and I

think I can understand it and some ways have used them."[৮৩]

তিনি গ্রোটোস্কির কাজ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার প্রয়োগও করেছেন। ১৯৬৯ সালে পোল্যান্ড সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরে এসেই তিনি 'প্রলাপ', 'সারারাত্তির', 'শেষ নেই' প্রভৃতি নাটক করেছেন, তাতে যে গ্রোটোস্কির পুওর থিয়েটারের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর 'The Third Theatre' বইয়ে লিখেছেন—

> "... Grotowski's work and his comments on theatre were fresh in my mind. Not much of those was reflected direcly in our production of 'Pralap', and the subsequent productions of 'Sararattir', 'Sesh Nei' and 'Ballavpurer Rupkatha' except one vital principle - the concept of the *Poor Theatre*."[৮৪]

প্রশ্ন জাগে তিনি কি তাহলে সম্পূর্ণ গ্রোটোস্কির থিয়েটারকেই নকল করেছেন? উত্তরটা এককথায় না। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রোটোস্কির থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের থিয়েটার আঙ্গিকের মিল থাকলেও দু'জনের থিয়েটার পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে আলাদা। গ্রোটোস্কির থিয়েটার মুক্ত থিয়েটার বা ফ্রি থিয়েটার নয়। থিয়েটারে নাট্যাভিনয় করে জনতার কাছে যাওয়ার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। গ্রোটস্কি প্রচণ্ড ট্রেন্ড করা কর্মীদের নিয়ে কাজ করেন। ব্যালে স্কুলের ছ'বছরের হোলটাইম কোর্স অথবা ড্রামা স্কুলের পাঁচ বছরের হোল টাইম কোর্স পাশ করা নাট্যকর্মীদের নিজের থিয়েটারে যুক্ত করে নিজে চার-পাঁচ বছর প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেন। তিনি নির্দিষ্ট দর্শকের জন্যই থিয়েটার করতেন। এ প্রসঙ্গে দর্শন চৌধুরী যে তথ্য দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন—

> ''তাঁর সবচেয়ে খ্যাতিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'দ্য কনস্টান্ট প্রিন্স'— পোলিশ ল্যাবরেটরি থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে মোট ৪০ জন করে প্রতি শো'তে দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। এবং নিয়মিত অভিনয়ে এই চল্লিশজন করে দর্শকই নাটকটার অভিনয় দেখতে পেত।"[৮৫]

বোঝাই যাচ্ছে অভিনেতা-অভিনেত্রী গ্রহণ করে নাট্যপ্রযোজনা— সবক্ষেত্রেই তিনি থিয়েটারকে পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়ে একটি গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ল্যাবরেটরি থিয়েটারেই আবদ্ধ ছিল। ''দর্শকের মোহ ছাড়তে হবে— এই আপ্তবাক্যের কারণেই তিনি এর বাইরে তাঁর কোনো নাটকের অভিনয় করেননি।"[৮৬]

বাদল সরকারের থিয়েটার এইখানে গ্রোটোস্কির থিয়েটার থেকে স্বতন্ত্র। প্রায় প্রথমাবধি

সেই চেষ্টাই করেছেন কীভাবে নাটককে দর্শকের কাছে হাজির করা যায়। করতে করতেই সেই পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি অঙ্গনমঞ্চের নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকের মধ্যে থিয়েটারকে গবেষণাগারে আবদ্ধ না রেখে মুক্তমঞ্চের অসংখ্য দর্শকের মাঝে হাজির করেছেন। কার্জন পার্কে 'সাগিনা মাহাতো'-র অভিনয় কিংবা 'মিছিলের অভিনয়' দেখে কয়েক হাজার দর্শক। পথচলিত জনতাও দর্শকে সামিল হয়ে যেত। কারণ তিনি মনে করেন— ''থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের।/ সর্বসাধারণে।/...থিয়েটার খোলা মাঠ আর আকাশ।/থিয়েটার পোশাকে মোড়া পুঁটলি নয়।/ সজীব-প্রাণ।/... কয়েক মুহূর্ত বর্ম-মুখোশ ফেলে সত্যিকারের মানুষের প্রকাশের সুযোগ থিয়েটারে।/ এই প্রকাশের 'মুহূর্ত' একদিন 'প্রতিদিন' হবে, এটাই আজকের স্বপ্ন।/সত্যিকারের থিয়েটার সে স্বপ্নের বাহন।''[৮৭]

পোল্যান্ডের গ্রোটোস্কির থিয়েটার আঙ্গিকের পাশাপাশি বাদল সরকারের থিয়েটার আঙ্গিকের মিল রয়েছে রিচার্ড শেখনার-এর 'পারফরম্যান্স গ্রুপ'-এর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর সঙ্গে। রিচার্ড শেখনার-এর থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করার আগে জানা প্রয়োজন কে এই রিচার্ড শেখনার? রিচার্ড শেখনার থিয়েটারে পারফরর্মিং আর্ট তত্ত্বের অন্যতম একজন প্রয়োগকারি। 'এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার' তাঁর প্রকাশের মূল মাধ্যম ও পছন্দ। ষাটের দশকে আমেরিকা সহ চিন, জাপান এমনকি ভারতেও তাঁর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি সহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক এবং বিখ্যাত দি ড্রামা রিভিউ-এর সম্পাদক। তাঁর এনভায়রণমেন্টাল থিয়েটারের মূল বৈশিষ্ট্য হল পারফরম্যান্সের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৬৯ সালে 'ডায়োনিসাস ইন সিক্সটি নাইন' প্রযোজনা দিয়ে এই থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয়। তারপর করেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত প্রযোজনা 'মাদার কারেজ'। একটি সাক্ষাৎকারে রিচার্ড শেখনার তাঁর থিয়েটারের নান্দনিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি কী তাঁর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন—

> ''... এখানে স্থান (স্পেস) কে নির্মাণ করে ঘটনা (ইভেন্ট)। দর্শকদের এখানে জড়িত করা হয়। লিখিত নাট্যরূপ, আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনা বা পারফরম্যান্সের একটা অংশমাত্র। এখানে সাংগীতিক নাট্যরূপ (মিউজিক্যাল টেক্সট), শরীরি নাট্যরূপ (বডি-টেক্সট) এবং এইরকম আরো অনেক কিছু আছে। এইগুলোই হল আমার থিয়েটার তত্ত্বের উৎকর্ষ।''[৮৮]

আর এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার কী? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন—

> ''ঘটনা জায়গা তৈরি করে। প্রতিটি নাট্য-ঘটনা তাদের উৎসগুলির সংগে তাদের

সম্পর্ককে তুলে ধরা উচিত— তা সে নাটক, মানুষ কিংবা উভয়েই হোক না কেন। এটি একটি অনুষ্ঠিত হওয়ার জায়গা। এটিকে কেবলমাত্র নাটকীয় ভাবে স্পেসের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয় নি। এটি নিজে নিজেই জায়গা তৈরি করে নিচ্ছে এবং প্রসেসের মধ্যে যা কিছু আছে তা দর্শকই হোক বা অংশগ্রহণকারীই হোক তাদেরকে গ্রহণ করছে। এই সব কিছুই ভালভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যাতে আপনি ঠিক করে নিতে পারেন কি আপনি পারফর্ম করতে যাচ্ছেন এবং কি ভাবে সম্পর্কযুক্ত করছেন সেই সব মানুষদের সংগে যারা এগুলিকে গ্রহণ করছে।... এই সবকিছুকেই ভালভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে, অন্বেষণ করতে হবে এবং প্রত্যেকবার সতেজ ও তরতাজা করে নিতে হবে— এটাই হল এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার।"[৮৯]

রিচার্ড শেখনার ছিলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘোর বিরোধী। এই শেখনারের সঙ্গে বাদল সরকারের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় তারপর ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শেখনার কলকাতায় বাদল সরকারের থিয়েটার দেখেছেন। শেখনারের আমন্ত্রণে ১৯৭৩-এ বাদল সরকার আমেরিকায় গিয়ে তাঁর 'এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার' দেখেছেন। তাঁর দলের সঙ্গে দু'মাস কাজ করেছেন। বাদল সরকার শেখনারের থিয়েটার পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই শেখনারের থিয়েটারের প্রয়োগরীতির কিছু কিছু প্রভাব বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে পড়ে। বিশেষ করে শেখনারের নাট্যওয়ার্কশপ এবং শারীরিক অভিনয় রীতি বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটারে প্রয়োগ রীতির ক্ষেত্রে গভীরভাবে ব্যবহার করেছেন। বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারে কীভাবে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং ব্যবহার করেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন—

"প্রথম শিখেছি বেশ খানিকটা রিচার্ড শেখনারের (জন্ম: ১৯৩৪) কাছ থেকে। তার দলের সঙ্গে কাজ করে গ্রুপ এক্সারসাইজগুলো শিখি, ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করি, সেখান থেকেই প্রসেসটা আরম্ভ হয়েছিল।"[৯০]

বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের নির্মাণগত বা শৈলীগত দিক থেকে যে কতটা শেখনারের দ্বারা প্রভাবিত, সেকথা বলতে গিয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটারের নির্মাণগত বা কৌশলগত মাত্রার দুটি দিকের দ্বিতীয়টি, ব্যক্তিনটের ব্যক্তিত্ব মন্থন করে তার নিজস্ব যাবতীয় স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা জারিত করে অন্য এক সত্তায় আত্মস্থ হয়ে নটগোষ্ঠীর সঙ্গে ও নাটকের বিষয়গত আবেগের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষ্য নির্বাচন ও নির্ধারণ শেখনার-এর

> এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর ওয়ার্কশপ পদ্ধতি থেকেই বাদলবাবু আহরণ ও শিক্ষা করেছেন। ... তার মৌলিকতা এতটুকু লাঘব না করেও কিন্তু মানতেই হবে, শেখনার-এর এক কর্মদর্শনই তাঁকে আজীবন চালিত করেছে।"[৯১]

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতিতে শেখনারের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শারীরিক অভিনয় রীতির ক্ষেত্রে বাদল সরকার অনেকাংশে শেখনারের কাছে ঋণী। কিন্তু অন্য বহু ক্ষেত্রে নিয়েও বলা যায় বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতি শেখনার অপেক্ষা নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। বাদল সরকার শেখনার-এর শরীরী অভিনয়ের বেশ কিছু অংশগ্রহণ করলেও শেখনার যেভাবে তাঁর থিয়েটারে শরীরী অভিনয়ে গণ উন্মাদনা গড়ে তুলতে চান এবং তার জন্য প্রয়োজনে যৌনতা ও নগ্নতাকে কাজে লাগান, বাদল সরকার সে পথে হাঁটেননি। বাদল সরকার এই ধরনের গণউন্মাদনার চেয়ে দর্শকের চেতনার বিকাশকেই প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়েছেন। বাদল সরকার শেখনারের কাছ থেকে শারীরিক অভিনয়ের প্রক্রিয়ার জোরটুকু গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রযোজনায় সেগুলিকে সম্যক ব্যবহারের অনুশীলন করেছেন। কখনই তাঁর মতো শরীর সর্বস্বতা, যৌনতা কিংবা নগ্নতায় অভিনেতার শরীরকে ব্যবহার করেননি।

শেখনারের কাছে ফ্লেক্সিবিলিটি এনভায়রনমেন্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ নাট্যের বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাদল সরকার শেখনারের থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের তুলনা টানতে গিয়ে বলেছেন—

> "... আমার কাছে Content-টা ভীষণ important, environmental theatre আমার কাছে important নয়। কাজেই একেবারে আগাগোড়া তফাৎ।"[৯২]

সেই সঙ্গে বাদল সরকার একথাও বলেছেন—

> "At the same time ওদের কাছে ঐ workshop process-টা, ওদের non-proscenium theatre করার অভিজ্ঞতা, তার approach-টা ওদের থিয়েটারে exercise-গুলো শেখা, work-shop games-গুলো অন্তত প্রাথমিকভাবে শেখা যার ফলে প্রয়োজনে আমি অদল-বদল করে নিয়েছি।"[৯৩]

বাদল সরকার যে ধরনের থিয়েটার করেন তাঁর সঙ্গে শেখনারের থিয়েটারের কিছু মিল অবশ্য আছে। আর এই কারণে শেখনারের থিয়েটারকর্ম তাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি শেখনারকে নকল করেননি। যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন সেটা নিজের মতো করে তাঁর থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় আমেরিকার

আর এক নাট্যকার জুলিয়ান বেক (Julian Beck) ও জুডিথ ম্যালিনা (Judith Malina)-র লিভিং থিয়েটার-এর সঙ্গে। লিভিং থিয়েটারও শেখনারের এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটার-এর মতোই শারীরিক অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। এই থিয়েটার অনেকটা পথ নাটকের মতো। এদের কাছে রাজনৈতিক মতাদর্শকে থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরাটাই মূল কথা। লিভিং থিয়েটারে কনটেন্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বাদল সরকার এ কারণেই জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনাকে খুব সম্মান করতেন। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''... কতকগুলো Content based theatre যেখানে আমাদের সঙ্গে মিল আছে এবং সেই হিসেবেই 'জুলিয়ান বেক' লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করেছি, ঐ approach টাকেই আমি শ্রদ্ধা করেছি, ...''[৯৪]

লিভিং থিয়েটারে যেভাবে জনসংযোগ তৈরি করা, মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব দর্শনকে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়— সেখানেই বাদল সরকারের থিয়েটার তার অনেকটা কাছাকাছি। বাদল সরকার যেভাবে স্টেজ ছেড়ে দর্শকের সঙ্গে স্থান ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেছেন, লিভিং থিয়েটারেও তাই। বাদল সরকার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৯৭১ সালে কলকাতার এ.বি.টি.এ হলে 'সাগিনা মাহাতে'র পরীক্ষামূলক অভিনয়ের সময় যেভাবে স্টেজ এবং অডিটোরিয়ামকে উপেক্ষা করে দর্শকের সমতলে নেমে এসে অভিনয় ক্ষেত্রটাকে ব্যবহার করেছেন তা অনেকটা লিভিং থিয়েটারের মতো। বাদল সরকার বলেছেন—

> "The living Theatre is considered as the first principal initiator of the new theatre in America. The living Theatre very rarely uses theatre halls and even when it does, the distinction between the stage and the auditorium is completely igored."[৯৫]

লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকগত মিল বলতে গেলে ওইটুকুই। বাদল সরকার এ কারণেই বলেছেন—

> ''... ওদের একেবারে form-এর ব্যাপারটা আমেরিকান, অথবা Euro-American Situation-এর ব্যাপার। সেটা আমাদের ভারতবর্ষে একেবারেই applicable নয়, ...''[৯৬]

লিভিং থিয়েটার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করলেও তা শেষপর্যন্ত ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির চর্বিতচর্বণ হয়ে পড়ে। তারা শারীরিক অভিনয়ের উপর জোর দিলেও বক্তব্যের বিক্ষিপ্ততার কারণে তাদের শারীরিক অভিনয়ও ক্রমে প্রয়োগের সার্থকতায় ব্যবহৃত না হয়ে শরীর সর্বস্ব হয়ে

পরে। লিভিং থিয়েটারের সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের তুলনা করতে গিয়ে দর্শন চৌধুরীর মূল্যায় এ প্রসঙ্গে ভীষণ যুক্তিযুক্ত। তিনি লিখেছেন—

> ''বাদল সরকার এঁদের শরীরী অভিনয়ের বেশ কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো দিকেই এঁদের তেমন কোনো প্রভাব বাদল সরকারে নেই। তার অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ে চাঁদা দেওয়া সদস্যদের নিয়ে সবশুদ্ধ খুব বেশি দর্শক অভিনয় দেখতে পেত না। ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে তিনি সাধারণ মানুষের মাঝখানে, গ্রামাঞ্চলে, কারখানায় হাজার দর্শকের কাছে তাঁর নাটক ও নাট্যাভিনয় নিয়ে গিয়েছেন।''[৯৭]

এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বাদল সরকার লিভিং থিয়েটার থেকেও কিছু কিছু তাঁর থিয়েটারে নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাকে নকল না করে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকার তাই বলেছেন—

> ''খুব একটা তফাৎ হবে না, এই যে Identify যদি আমাদের থিয়েটারকে করা হয়, জুলিয়ান বেক-র সঙ্গে হোক বা রিচার্ড থেটনার-এর environmental theatre-এর সঙ্গেই হোক, খুব ভুল করা হবে, আদান-প্রদান আমাদের কতকগুলো হয়েছে এবং সেই আদান-প্রদানে আমি উপকৃতই হয়েছি, কারণ খুব একটা অল্প বয়েসে তো আমার এতগুলো ঘটেনি তাই যেটা দরকার সেটা নেওয়া বা নিয়েও অন্যভাবে ব্যবহার করা, assimilate করা বা বদলে নেওয়া এটার অসুবিধে হয়নি।''[৯৮]

এইসব বিদেশী থিয়েটারের সঙ্গে কোন না কোন দিক থেকে বাদল সরকারের থিয়েটারের সাদৃশ্য অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে নানা সময় নানা কারণে বাদল সরকার বিদেশে থেকেছেন আর সেই সূত্রেই এইসব বিদেশী নাট্যব্যক্তিত্ব ও তাঁদের থিয়েটারের কাজকর্ম দেখেছেন। ফলে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারে সরাসরি এইসব বিদেশী থিয়েটারের একটা প্রভাব অনিবার্যভাবেই পড়েছে। কিন্তু এর বাইরেও বিদেশী আরো বহু থিয়েটার বা নাট্যব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদের প্রভাব বাদল সরকারের থিয়েটারে না পড়লেও আঙ্গিকগত দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলতে হয় জার্মানির নাট্যব্যক্তিত্ব বার্টোল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬)-এর কথা। হিটলার শাসনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রেখট দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি অবশ্য প্রসেনিয়াম মঞ্চকেই ব্যবহার করে এই চেষ্টা করেছেন। তিনি নাট্যভিনয় চলাকালীন প্রায়শই দর্শকের মাঝে চলে যেতেন। নাটকের অভিনয় থামিয়ে রেখে দর্শককে

নাট্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে উৎসাহিত করতেন। দর্শন চৌধুরী লিখেছেন—

> ''অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকের মধ্যে চলে যান, দর্শক থেকে উঠে আসেন, আবার অভিনয়কালে দর্শকের সঙ্গে অবিরাম সংযোগ রক্ষা করে চলেন। এইভাবে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা ব্রেখটের নাট্যপ্রযোজনায় দেখা যায়।''[৯৯]

ব্রেখট-এর এই যে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংযোগের চেষ্টা এটাই তো বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে করেছেন। প্রয়োগের ধরণটা অবশ্যই আলাদা কিন্তু নাট্য আবেদনে কোনও ফারাক নেই। আর একজন নাট্যব্যক্তিত্বের কথা এ প্রসঙ্গে আসে, তিনি হলেন ব্রাজিলের নাট্যকার প্রযোজক আগাস্তো বোয়াল (জন্ম: ১৯৩১-২০০৯)। শুরু থেকে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এসেছেন তিনি। বোয়ালও প্রসেনিয়ামের বাঁধামঞ্চ ছেড়ে মুক্তমঞ্চে নেমে এসেছেন তাঁর নাটক নিয়ে। তিনি দর্শককে তাঁর নাট্যাভিনয়ের অংশ হিসেবে দেখেছেন। দর্শন চৌধুরী তাঁর নাট্যকর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> ''সেখানে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দর্শকও তাতে যোগ দেয়। আবার দর্শক কী বলছে, কী চাইছে সে শুনে ও বুঝে তৎক্ষণাৎ অভিনেতারা তাদের বক্তব্য তৈরি করে বলতে থাকেন। দর্শক ও অভিনেতার মিলিত সংযোগে গড়ে উঠতে থাকে নাটকের পরিবেশ।''[১০০]

অর্থাৎ দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক যৌথ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নাট্যবিষয়ের নির্মাণ ও বিস্তারই হল বোয়ালের থিয়েটারের (Theatre of the Oppressed) আসল কথা। বাদল সরকার অগাস্তো বোয়ালের নাট্যপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত যে হননি সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে নাটক নিয়ে দর্শকের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং তাদের সামাজিকভাবে সচেতন করার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের সঙ্গে শৈলীগত সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

বাদল সরকার প্রবর্তিত তৃতীয় থিয়েটারের নাট্য আঙ্গিক নির্মাণে বিদেশী এইসব থিয়েটার প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষভাবে হোক নিঃসন্দেহে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার, সেগুলিকে তিনি অনুকরণ করেননি। বিদেশের এইসব নাট্যব্যক্তিত্ব ও থিয়েটারের কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করলেও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনি সেগুলি কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর থিয়েটারের সঙ্গে এইসব থিয়েটারের সাদৃশ্য কি, এর উত্তরে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''সেটা 'গ্রোটোস্কি', 'থেটনার', 'উইলিয়াম বেথ' যারই হোক না কেন মিল

> বলতে গেলে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না, আমি আমার ভারতবর্ষের কতকগুলো আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে, রাজনৈতিক অবস্থাতে একটা particular theatre আমরা বেছে নিয়ে করছি, এটা একেবারেই আমাদের এখানকার।"[১০১]

তিনি আমাদের স্পষ্ট করেই বলেছেন বিদেশী নানা থিয়েটারের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর তৃতীয় থিয়েটার একেবারেই আমাদের এখানকার। অর্থাৎ বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের আঙ্গিকের সাদৃশ্য যদি খুঁজতেই হয় তাহলে আমাদের এদেশের লোকনাট্য, যাত্রার সঙ্গেই খুঁজতে হবে। এই আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রথমেই লোকনাট্য এবং যাত্রার মতো দেশজ অভিনয়রীতির স্বরূপ দেখে নেব।

নাট্যকলার প্রাচীনরূপ হল লোকনাট্য। সাধারণভাবে বলা যায়, লোকসমাজের দ্বারা রচিত ও অভিনীত লোকসমাজের জন্য লোকসমাজের নাটকই লোকনাটক। গ্রামীণ সমাজে লোকসাধারণের জীবন অবলম্বন করে এটি গড়ে ওঠে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> ''গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[১০২]

লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির ওপরই অনেকাংশ নির্ভরশীল। আর সেই কারণে তা সংহত সমাজের কাছে আদৃত হয় বহুল পরিমাণে। কিন্তু কখনো কখনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক বিষয়ও লোকনাট্যে স্থান পায়। যেমন— রামায়ণ অবলম্বনে কুশান কিংবা রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রার মতো লোকনাটক। এগুলো তো পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আসলে লোকজীবনের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কার ভাবনা থেকেই লোকনাট্যের উৎপত্তি। অঞ্চল বিশেষের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিশেষ বিশেষ লোকনাট্যের জন্ম এবং তাঁদের দ্বারাই তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। তাই স্থান, কাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিকতা ভেদে লোকনাট্যের বৈচিত্র্য দেখা যায়। মূলত গীত-নৃত্য-বাদ্য এবং সংলাপের সমন্বয়ে গড়ে উঠে লোকনাট্য। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে স্থানিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব ও পূজাপার্বণ। এদেশের লোকনাট্যের ধারা অনেক সমৃদ্ধশালী। বিষহরা, চোরচুন্নীর গান, পালাটিয়া গান, কুশান, হালুয়া-হালুয়ানি, আলকাপ, খন, ছৌ, সঙ, গম্ভীরা, লেটো, ভাদু, টুসু, রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, বেহুলা ভাসান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লোকনাট্য। লোকনাট্যে নৃত্য ও গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, তাই অনেক ক্ষেত্রেই লোকনাট্য লোকসঙ্গীত বা লোকগান নামেও পরিচিত। এইসব লোকনাট্যের নিজস্ব কিছু আঙ্গিক ও লক্ষণ আছে। সেগুলি

মোটামুটি এইরকম—

১. লোকনাট্য মূলত মৌখিক সংলাপ নির্ভর। পূর্ব নির্ধারিত কোন লিখিত নাট্যকাহিনিও এতে থাকে না। তবে গল্পটা থাকে। সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঠিক রেখে নিজের মতো করে সংলাপ তৈরি করে নাট্য কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একারণে নাট্যকাহিনি অনেক সময়ই দীর্ঘায়িত হয় এবং দেখা যায় সময়ের বাঁধাধরা ব্যাপারটা এখানে রক্ষিত হয় না।

২. প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত লোকনাট্যের অভিনয় হয় খোলা মঞ্চে। উপরে কখনো সামিয়ানা বা কখনো ত্রিপল দিয়ে ঢাকা থাকে। মঞ্চে কোন উপকরণের বাহুল্যতা থাকে না। এখানে কোন বাস্তবের ইলিউশন সৃষ্টির কোন চেষ্টা থাকে না। লোকনাট্যের চতুর্দিক অনাবৃত ও উন্মুক্ত থাকে। স্বল্পালোকে অথবা দিনের আলোয় অভিনয় হয় লোকনাট্য। সামান্য মেক-আপ এবং একটা দুটা বেঞ্চ কিংবা চেয়ার মঞ্চে রাখা হয় কখনো রাজা মন্ত্রীর সিংহাসন হিসেবে দেখানোর জন্য। অর্থাৎ নিরাবরণ, নিরাভরণ এবং নির্মেদ নাট্যধর্মই হল লোকনাট্যের অন্যতম আঙ্গিক।

৩. অভিনয়স্থলটি মূলত হয় বৃত্তাকার। মঞ্চের মাঝখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী, বাদ্যযন্ত্রী সবাই এক সঙ্গে বসে। সেখান থেকেই উঠে গিয়ে অভিনেতারা তাদের অভিনয় চালিয়ে যায়। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আবার ঐ স্থানে গিয়ে বসে। গোটা অভিনয় প্রক্রিয়াটি এইভাবে সম্পন্ন হয়। অবশ্য লোকনাট্যের প্রকার এবং স্থান বিশেষে মঞ্চের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। উন্মুক্ত সমতল ভূমি মূলত মঞ্চায়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। যেমন, 'কুশান' লোকনাট্যের আসর বসে ফাঁকা মাঠে অথবা 'খলান'-এর মাঝখানে যে কোন ধরনের ছাউনি দিয়ে। আবার 'চোরচুন্নী' গানে মঞ্চের কোন ব্যাপার নেই। কোন গৃহস্থ বাড়ির উঠানে বা বাড়ির সামনের জায়গায় নৃত্য ও গানের সহযোগে অভিনীত হয়।

৪. লোকনাট্যে কুশীলব সংখ্যা খুব সীমিত। লোকনাট্যে একজন অভিনেতা একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে। সামান্য মেক-আপ পরিবর্তন করেই একজন অভিনেতা সেনাপতি থেকে মালি চরিত্রে অভিনয় করতে পারে। তাতে দর্শকের কোন অসুবিধা হয়না। কুশীলবদের মধ্যে লোকনাট্যে অন্যতমএকটি চরিত্র হল 'গীদাল' মূল গায়েন। যিনি অভিনয় শুরুর আগে বন্দনা করে এবং গোটা নাট্যকে সে-ই পরিচালনা করে। তার সাজ পোশাক একবারেই সাধারণ, যেমন ধুতি, পাঞ্জাবি চাদর বা গামছা এই রকম সাধারণ পোশাকই ব্যবহার করে। প্রায় প্রত্যেক লোকনাট্যেই আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে, একাধিক 'ছোকরা' বা 'ছুক্‌রি' থাকে। মূলত পুরুষেরাই পরচুলা পড়ে মেয়েদের মতো শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ এবং সুউচ্চ বক্ষ বন্ধনী, হাতে চুড়ি এবং নিম্নমানের প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে সেজে গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ করে আসর মাতিয়ে রাখে। বর্তমানে যুগের দাবী মেনে

লোকনাটকেও পুরুষের জায়গায় মেয়েরাই ছুক্‌রী সেজে নাচ-গান করে। এর পাশাপাশি লোকনাট্যে একটি মজাদার চরিত্র প্রায়ই থাকে, সেটা হল ভাঁড় চরিত্র। ভাঁড়েরা মাঝে মাঝেই গল্পের ভেতর ঢুকে পড়ে সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে টেনে আনে। সেটা নিয়ে কিছু রঙ্গব্যঙ্গ করে লোক হাসাবার চেষ্টা করে।

'গীদাল' এবং অন্যান্য কুশীলবদের মূল সহায়ক হিসেবে থাকেন দোহার। নাটকের পালা চলার সময় এই দোহার নায়ক-নায়িকা বা অন্য কোন চরিত্রের 'ধুয়া' ধরে বা 'দোহারকি করে। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ , হাসি-ঠাট্টা চলতে থাকে।

৫. নৃত্য-গীত সহযোগে যেহেতু লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয় স্বাভাবিক ভাবেই নানারকম বাদ্যযন্ত্র এতে ব্যবহার করা হয়। আগে তাদের নিজেদেরই তৈরি করা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যেমন দোতরা, ঢাক খমক, খোল, বাঁশী, সারিঙ্গা ইত্যাদি দেশজ যন্ত্র ব্যবহার করা হত। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছু নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। যেমন হারমোনিয়াম, ফ্লয়েট, ক্ল্যাসিওনেটের মতো আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রীরা 'গীদাল' ও অন্যান্য কুশীলবদের সঙ্গে একসাথে অভিনয় স্থলের মাঝখানে বসেন।

৬. লোকনাট্যের অভিনয়রীতিতে দর্শকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের মতো লোকনাট্যের দর্শকরাও হয় সাধারণ। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাদের মধ্যে বিস্তর কোন ব্যবধান থাকে না। লোকনাট্যের কুশীলবরা যেমন বেশিরভাগ দরিদ্র, নিরক্ষর হয়ে থাকেন দর্শকরাও তাদের মতোই সাধারণ। দর্শকরা পরিপাটি হয়ে পালা দেখতে আসেন না। বাড়ির কাছেই হয়তো কারও বাড়ির উঠনে পালা চলছে কাজ করতে করতেই হঠাৎ করে চলে গেলেন সেই পালা দেখতে। দর্শকের মাঝখানে যেহেতু অভিনয় চলে ফলে অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের একটা ঘনিষ্ট সংযোগ ঘটে। তারা হতে পারেন নিরক্ষর কিন্তু কল্পনাশক্তিতে ভীষণ প্রখর। আর লোকনাট্যে এই কল্পনা শক্তিকেই কাজে লাগানো হয়। কল্পনায় তারা একটি সাধারণ কাঠের চেয়ারকে রাজসিংহাসন ভেবে নিতে পারে, এক রোগা অপুষ্টির শিকার গ্রাম্য অভিনেতাকে জমিদার ভেবে নিতে পারে। তাতে রসপিপাসায় কোন খামতি হয় না। কিছু কিছু ভ্রাম্যমান লোকনাট্য আছে যেখানে লোকনাট্য দলের সঙ্গে দর্শকও পিছু পিছু চলে যান। যেমন চোরচুন্নী গানের মতো কিছু লোকনাট্য আছে, যেগুলি একবাড়ি থেকে আরেক বাড়ি এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে দলবল নিয়ে চলে। অনেক সময় দেখা যায় চোর-চুন্নী গানের রসসাধন তৃপ্তির জন্য দর্শকও তাদের পিছন পিছন চলে। কীর্তনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা যায়। গ্রামে নগরকীর্তনের দলের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোকও অনেক সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং

দর্শক প্রায় একাকার। আর এখানেই লোকনাট্যে আসল শক্তি। এই শক্তিতেই যুগের পর যুগ ধরে এই ধারা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজও টিকে আছে।

৭. লোকনাট্য মূলত ফ্রি থিয়েটার। আয়োজনে যেহেতু আড়ম্বর থাকে না ফলে খরচ অনেক কম হয়। ইলেকট্রিসিটি লাগে না। তাদের সামান্য আয়োজনে অভিনয় চলে। কোন অভিনেতা হয়তো অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই, হাতে তালপাতার পাখা দিয়েই একটু বাতাস করে নিলেন। কখনো দর্শকের কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে নিলেন। মঞ্চে সামান্য দু'একটা চেয়ার বা বেঞ্চ থাকে তা গ্রামের লোকেই যোগান দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সেট, সেটিং প্রায় নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবে লোকনাট্যে খরচ খুব সামান্য। দর্শকদের টিকিট কাটার দরকার হয় না। লোকনাট্যের দলকে কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। লোকনাট্যের দলকে নতুন করে প্রযোজনা করতে কোন প্রজেক্ট বা প্রোপোজালের দ্বারস্থ হতে হয় না। যদিও কিছু কিছু লোকনাট্যে একজন পৃষ্ঠপোষক থাকেন। একসময় কোন স্থানীয় জমিদার, জোতদার সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার এই পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করতেন। বর্তমানে অনেক সময় স্থানীয় পূজা কমিটিই লোকনাট্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তারা কিছু অর্থ লোকনাট্যের দলকে দিয়ে থাকেন। আর পাশাপাশি অভিনয় নাট্যকাহিনির অংশ হিসেবেই দেখিয়ে দর্শকের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। যেমন ধরা যাক শিষ্য তাঁর গুরুকে দান করতে চান কিন্তু তার কাছে অর্থ নেই; তখন সেই অভিনেতা ঘাড়ে গামছা বা চাদর পেতে উপস্থিত দর্শকের মাঝে গিয়ে ঘুরতে থাকেন। তখন সেই দুঃখ দেখে অশ্রুসজল দর্শক যে যার সাধ্য মতো সেই চাদর বা গামছায় অর্থ দান করে সাহায্য করেন। এইভাবে অভিনয় চলতে থাকে আর কিছু অর্থ সংগ্রহ ও চলতে থাকে। লোকনাটকে অর্থ সংগ্রহের এই রীতিকে 'মাঙন' বলা হয়। এই দিয়েই লোকনাট্যের দল রজনীর পর রজনী দিনের পর দিন অভিনয় চালিয়ে যায়। অভিনেতা-দর্শকের এই পারস্পরিক সংযোগই অভিনয় হয়ে ওঠে মানবিক। অভিনেতা এখানে রোজগার করতে আসে না, কারণ এটাকে তারা কখনোই জীবন-জীবিকার অঙ্গ হিসেবে দেখে না। যেটা করেন সেটা মনের আনন্দে। ফলে লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে লোকনাট্য মুক্ত।

৮. লোকনাট্য মূলত ধর্মাশ্রয়ী। ধর্মকথা, দেবকথা, পুরাণকথা , বীরপূজা লোকনাট্যের বিষয়। তবে ধর্মাশ্রয়ী হলেও বাস্তব জীবনের নানা সমস্যাও তার মধ্যে উঠে আসে। আলকাপ, সঙ প্রভৃতি লোকনাট্যে প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে কিংবা গণতান্ত্রিক সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কখনো কখনো ব্যঙ্গবিদ্রুপ ধ্বনিত হয়। বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনা ও অভিঘাতকে লোকনাটকের

বঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করা হয়। চোর-চুন্নী গানে উঠে আসে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা। পুরুলিয়ার ছৌ, বাহ্যিকরূপে ধর্মীয় মনে হলেও তা আদ্যন্ত রাজনৈতিক। তাদের দুঃখ, সংগ্রামের কথাই উঠে আসে ছৌ লোকনাট্যে। ''আর গম্ভীরা, আলকাপ, লেটো, ধর্মপালা, সঙ— সেসব তো সরাসরি রাজনৈতিক।''[১০৩] অর্থাৎ লোকনাট্যে ভাবের অভিব্যক্তি যেমন আছে তেমনই আছে জীবনের শ্রম সচেতনতার প্রতিফলন। একদিকে ভক্তির ভাববিহ্বলতা আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, হতাশা-সব মিলিয়ে লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষের ভাব প্রকাশের এক অন্যতম নাট্যমাধ্যম। যেমন— কীর্তন। কয়েক'শ বছর পর আজও গ্রাম আধা মফস্বলে নিয়মিত কীর্তনের আসর বসে। যেকোন কারণ ছাড়াই এক বা একাধিক লোক মিলে উদ্যোগ নিয়ে কীর্তনের আয়োজন করে। হাজার হাজার মানুষকে আবিষ্ট করে সেই উদ্যোগ। তারা হাসে-কাঁদে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। আর সেটা শুধু ধর্মীয় কারণ নয় বলে মনে হয়। বাচিক ও আঙ্গিক, অভিনয়, সুর ও তালের বিচিত্র চলন, নাচ, কথকতা, পৌরাণিক গল্পের ছাঁদে সমকালকে জুড়ে দেওয়া-পারফরম্যান্সের এমন শক্তি ছাড়া বোধ হয় একটা সম্ভব হত না।

৯. লোকনাট্যে শারীরিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। মূলত অভিনেতার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, মূকাভিনয়, পদচালন, হস্ত সঞ্চালন প্রভৃতির মাধ্যমে অভিনয় ফুটিয়ে তোলা হয়। এগুলি কুশীলবরা নিজেরাই আয়ত্ত করে গুরু ধরে কারো কাছে শেখার দরকার হয় না। শারীরিক অভিনয় দিয়েই তারা দর্শককে হাসায়, ভাবায়, ক্রুদ্ধ করে তোলে, নীতিশিক্ষা দিয়ে থাকে। পুরুলিয়ার 'ছৌ' লোকনাট্য বীরভূমের রায়বেশে তো পুরোপুরি শারীরিক কসরৎ-এর উপর নির্ভরশীল। পায়ের সূক্ষ্ম কাজ, শরীরের বিভিন্ন অংশের সুচারু অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। দেহভঙ্গিতে আক্রমণ, প্রতিরোধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষণীয়। শরীরটা শূন্যে ভাসিয়ে আবার এক হাঁটু বা দুই হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়া, শূন্যে ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, হনুমানের অনুকরণে লাফ দেওয়ার মতো অসম্ভব সব শরীরী অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

১০. লোকনাটকের কাঠামোয় সাধারণ নাটকের মতো কোন 'অঙ্ক' বা দৃশ্য পর্বাঙ্ক থাকে না। যেহেতু নাট্যকাহিনি অলিখিত ফলে নগরনাট্যের মতো অঙ্ক বিভাজনের ব্যাপার নেই। তবে লেখনীর শাসন না থাকলেও একটা অলিখিত শৃঙ্খলা থাকে। এক ধরনের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ শৃঙ্খলা আছে বলেই লোকনাট্য নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে, মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে।

লোকনাট্য বাদ দিলে এদেশের দেশজ অপর একটি অভিনয় ধারা হল যাত্রা। লোকজীবনের সঙ্গে লোকনাট্যের মতো যাত্রার দীর্ঘদিনের প্রাণের সম্পর্ক। যাত্রার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দর্শন চৌধুরী বলেছেন—

> ''সংস্কৃত অভিধানে উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে 'যা'-ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে এর মধ্যে যাওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে। এই গমন উপলক্ষেই উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত বলে কালক্রমে উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে দেবমাহাত্ম্য শুধুমাত্র শোভাযাত্রায় নয়, একই স্থানে বসেই সবাই উপভোগ করত। ক্রমে দেবপরিক্রমা বন্ধ হল, কিন্তু এই ধরনের ধর্মানুষ্ঠান 'যাত্রা' নামেই প্রচলিত হল। কালক্রমে, এইরকম ধর্মোৎসবে নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ের উপাদানগুলি যুক্ত হতে থাকে। এইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবদেবীর কাহিনীকে নৃত্যগীত-সংলাপ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শন করাকেই 'যাত্রা' বলা হয়ে থাকে।''[১০৪]

শুরুতে লোকনাট্যের মতো যাত্রাও খোলা আকাশের নীচে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে দর্শকের মাঝে অভিনয় হতো। ধর্মীয় বিষয়বস্তুই ছিল যাত্রার প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণলীলা, ব্রজলীলার পাশাপাশি রামযাত্রা, মনসার ভাসানযাত্রা এই সবই ছিল যাত্রার প্রধান বিষয়। তারপর সময়ের সাথে সাথে যাত্রার বিষয়বস্তু এবং অভিনয়রীতিতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। উনিশ শতকের প্রাক্‌মুহূর্তে নব্যবাবুদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে যাত্রায় উঠে এল কবিগান, ঝুমুর, খেউড়, হাফ আখড়াই-র মতো অসুস্থ, নগরজীবনের কুরুচিকর বিষয়বস্তু। এমনকি সে সময় কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিরসও তরল উচ্ছ্বাস ও খিস্তি—খেউড়ের প্রভাব এড়াতে পারেনি। ব্রিটিশের সওদাগরি অফিসে কর্মরত নবোদ্ভুত নাগর সমাজ সারাদিনের কর্মক্লান্তির শেষে আমোদ-ফূর্তি চাইত। তাই দিনের বেলায় ধর্মকথা দিয়ে আরম্ভ হলে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যেত। সে সময় কিছু যাত্রামোদি মানুষ যাত্রার এই নিমজ্জন দশা থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন। বিষয়বস্তুর পাশাপাশি উপস্থাপন পদ্ধতিতেও নানা পরিবর্তন এলো যাত্রায়। প্রাচীন যাত্রার ভক্তি আর ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য এতে গৃহীত হল। যাত্রার দেশজরস সংস্কারের সঙ্গে নতুন কালের রসপিপাসা মিশ্রিত হল। নতুন এই যাত্রায় এলো নানা বিষয়, বিলেতি থিয়েটারের অনুকরণে থিয়েটারি অভিনয়, পারস্পরিক সংলাপ, গানের কথা ও সুরের বৈচিত্র্য, ব্যায়বহুল সাজসজ্জা, উচ্চাঙ্গের রাগরাগিণী এবং পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রও। ধীরে ধীরে যাত্রায় সঙ্গীত কমে অভিনয় অংশ বৃদ্ধি পেল। যাত্রা আর শোনার বিষয় নয়, যাত্রা হয়ে গেল দেখার বিষয়। অর্থাৎ সময়ে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থিয়েটারের অনেক কাছাকাছি অবস্থানে চলে এসেছে। এখন যাত্রা, লোকনাট্য আর পরিশীলিত নাট্যের মাঝামাঝি শিল্পরূপ। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি আর সিনেমা, নাটকের উপাদান গ্রহণ করে লোকভাষা, ধর্মাশ্রয়ী বিষয় বর্জন করে যাত্রা অনেকটা আধুনিক নাগরিক রূপলাভ করেছে।

আধুনিক যাত্রা একধরনের অতিনাটকীয় শিল্পকলা। এর নামকরণ থেকে সংলাপ উচ্চারণ, উপস্থাপন, আলোর কায়দা মেকাপ সবকিছু আড়ম্বরপূর্ণ।

লোকনাট্যের সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য যাত্রার আধুনিক রূপের সঙ্গে। যাত্রার আদিরূপের সঙ্গে লোকনাট্যের তেমন কোন তফাৎ নেই। সেখানে উভয়েই নিরাবরণ, নিরাভরণ এবং দর্শকের সঙ্গে গভীর সংযোগ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট। চিত্রপটের বদলে সেখানে চিত্তপটের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হত। যাত্রার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন—

> ''আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে না। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।''[১০৫]

যাত্রার এই জনসংযোগের ক্ষমতাকে হাতিয়ার করেই চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মভাবনা নিয়ে পথে নেমেছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মভাবনা নিয়ে পথে নেমেছিলেন। মহাপ্রভু বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক থেকে কাহিনি নির্বাচন করে, যাত্রাগানে অভিনয় করেন বলে আমরা জানতে পারি। দর্শন চৌধুরী লিখেছেন—

> ''নদীয়ায় তিনি রুক্মিনীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। নীলাচলে অভিনয় করেন ব্রজলীলা ও রাবণবধ পালা।''[১০৬]

এইসব অভিনয় থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারি চৈতন্যদেব এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মভাবনা প্রচারের জন্য জনসংযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন। বৃহত্তর জনগণের কাছে যাওয়ার জন্যই চৈতন্য গৃহবন্দী মঞ্চব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে খোলামঞ্চে জনতার কাছে গিয়ে অভিনয় করেছিলেন।

একই ভাবে যাত্রাগানের জনসংযোগের ক্ষমতাকে, তার আঙ্গিককে সফলভাবে কাছে লাগিয়েছেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪ খ্রি:)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তপ্ত পটভূমিকায় স্বদেশী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত চারণকবি মুকুন্দ তাঁর যাত্রাগান নিয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর 'মাতৃপূজা', 'সমাজ', 'আদর্শ', 'পল্লীসেবা', 'সাথী', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি যাত্রাপালা পরাধীন দেশবাসীর মনে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। এককথায় যাত্রাকে রাজনৈতিক চেতনার বাহন করে জাতির চিত্তকে জাগ্রত করার মহান ব্রত পালন করেছিলেন তিনি। যা স্বদেশী যাত্রা নামে পরিচিত। মুকুন্দ তাঁর স্বদেশ ভাবনা দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে নির্দিষ্ট কিছু কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয় চলাকালে হঠাৎ অভিনয় থামিয়ে দিয়ে দর্শকের উদ্দেশ্যে

স্বদেশ মন্ত্র জাগানোর জন্য রসমধুর বক্তৃতা দিতেন। আবার বক্তৃতা থামিয়ে পুনরায় সেই অভিনয়ে ফিরে আসতেন। এই পদ্ধতিতেই তিনি দর্শকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। দর্শক হয়ে উঠতেন অভিনয়ের অংশ।

দেশজ থিয়েটারের এই ধারাটির গুরুত্ব বুঝেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির প্রচলিত থিয়েটারের ঘরানা থেকে সরে এসেছেন। যাঁর প্রথম জীবনের স্বভাববাদী থিয়েটারে প্রবল সাফল্য তাঁর নাট্যচিন্তাকে বেঁধে ফেলতে পারেনি। বস্তুতঃ তাঁর নাট্যজীবনের শান্তিনিকেতন পর্ব (১৯০১-১৯১৫)-এর 'শারদোৎসব' (১৯০৮খ্রি:) থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের স্বতন্ত্র এই পথ প্রসেনিয়াম আর্চের বাইরে প্রসারিত হয়ে যায়। নাট্যঘর, উত্তরায়ণ, কোনার্ক-এ বা আম্রকুঞ্জের আঙিনা ছাড়িয়ে চলে যায়। অনেকে অবশ্য এর জন্য শান্তিনিকেতনের বাস্তব পরিস্থিতিকেই অন্যতম কারণ মনে করেন। একথা ঠিক ওই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর বেশ কিছু প্রযোজনা করেছেন, যেগুলি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যাবতীয় বিষয়কেই মান্যতা দিয়েই অভিনীত। যেমন ১৯১৬-র জানুয়ারিতে জোড়াসাঁকোতে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় কিংবা ১৯১৭-র অক্টোবরে 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় এগুলি প্রসেনিয়ামের বাঁধা মঞ্চেই অভিনীত হয় এবং প্রসেনিয়ামের যাবতীয় মঞ্চ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়। যদিও মঞ্চসজ্জায় খরচ কমানোর বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হত। আমাদের মনে হয় শান্তিনিকেতনে উপযুক্ত মঞ্চ ছিল না, উপকরণ পাওয়া যেত না, তাই শান্তিনিকেতনের নাট্যপ্রযোজনা এক রকম আর কলকাতার প্রযোজনা অন্যরকম হত, এই ধরনের যুক্তি খাড়া করে বিষয়টিকে লঘু করে দেখা চলে না। আশ্রমিক জীবনের উন্মুক্ত প্রতিবেশ নিশ্চিত ভাবেই তাঁর নাটকের ভঙ্গি ও বিষয়কে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু থিয়েটারকে বাঁধা মঞ্চের বাইরে এনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অভিনয়ের মূলে রয়েছে তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত সুগভীর ভাবনাচিন্তা। সচেতনভাবেই তিনি তাঁর নাট্যে প্রসেনিয়ামের বাইরে এদেশের লোকনাট্য-যাত্রা-কীর্তনের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। সেই অনুযায়ী নাট্য উপস্থাপনে এনেছেন নানা পরিবর্তন। বিশিষ্ট নাট্যপ্রাবন্ধিক অভিষেক বসু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''নিজের নাটককে যাত্রা কীর্তনের সমান্তরালে দেখতে চেয়ে কথা থেকে গানের সুরে, বা সংলাপের ভেতরের সুরে ক্রমশ ডুব দিচ্ছিলেন কবি, বাস্তবতাবাদের ছেঁদো যুক্তিতে কান না দিয়ে শারীরিক অভিনয় থেকে নাচের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি, আর বিষয়বস্তুর দিক থেকে নাটকের অন্দরে উঁকি দিচ্ছিল আনন্দময় গ্রামীণ যৌথতার স্বপ্নকল্প।''[১০৭]

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার নাট্যভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

> ''বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য।''[১০৮]

এই ধরনের থিয়েটারের দৃশ্যপট, মঞ্চ ব্যবস্থা সম্পর্কে এই সময় তাঁকে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। দৃশ্যপটের ব্যবহার আসলে দর্শককে এক ধরনের ঠকানোর কৌশল বলেই তিনি মনে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি এদেশের লোকানাট্য যাত্রার মতো কল্পনা শক্তির উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন—

> ''যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ। ... দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়— সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।''[১০৯]

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন এক্ষেত্রে আমাদের দেশের থিয়েটার অনেক বেশি মানবিক। আমাদের দেশজ থিয়েটারে বিলেতি থিয়েটারের মতো বাস্তবের বিভ্রম নেই। এখানে অভিনেতা ও দর্শক উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে তাই লিখেছেন—

> ''আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।''[১১০]

রবীন্দ্রনাথ বিলেতি থিয়েটারের আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চসজ্জাকে জঞ্জাল মনে করেছেন। তিনি থিয়েটারকে সেই জঞ্জাল থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন থিয়েটার ব্যাপারটি হল বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত নাট্যরূপ 'তপতী' (১৯ ভাদ্র, ১৩৩৬) নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

> ''অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায়

আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না।"[১১১]

তিনি মনে করেছেন এদেশের দেশজ থিয়েটার সেই কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। আয়োজনের অতিরিক্ত ভার থেকে তা মুক্ত। সেখানে চিত্রপটের চেয়ে চিত্তপটই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সেই দিকটি লক্ষ্য করে বলেছেন—

"আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঐদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।"[১১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যকে দেশজ এই লোকনাট্য যাত্রা গানের আঙ্গিকে দেখতে চেয়েছেন। কলকাতার প্রযোজনাগুলিতে হয়ত সেটা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যকে নিয়ে গেছেন এদেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য-যাত্রার স্তরে।

বিভিন্ন আলোচনায়, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি দেশজ লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের কোনদিনই প্রাণের যোগ ছিল না। একজন শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-এর পক্ষে কোন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ছাড়া গ্রামীণ লোকনাট্যের মতো অভিনয়ধারার সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। শহরের মানুষ হিসেবে বাদল সরকার প্রথম দিকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

"আমি নগরনাট্যটা মেনে নিয়েছি, যাকে পরে দ্বিতীয় থিয়েটার বলেছি। কারণ আমি নগরের লোক যেখানে থিয়েটার বলতে স্টেজই বোঝায় ...।"[১১৩]

একই প্রসঙ্গে অন্য একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

"লোকনাট্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ভীষণ ভাবে কম। সুযোগ পেলেই দেখি, আজও দেখি, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু পরিচয়টা ভীষণ কম।"[১১৪]

লোকনাট্য কিংবা যাত্রার সঙ্গে বাদল সরকারের পরিচয় সামান্য হলেও দেশজ এই অভিনয় ধারার আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। বাদল সরকার তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে থিয়েটার নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা করলেও দেশজ লোকনাট্য কিংবা যাত্রাগানের অঙ্গিককে যে থিয়েটার প্রয়োগ করা যায় এই দিকটা ভেবে দেখেননি। দেশজ লোকানাট্য যাত্রার প্রতি বাদল সরকারের আগ্রহ তৈরি হয় বিদেশের থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড-এ নাট্য দেখে। এই ধরনের থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় লণ্ডনে থাকাকালীন, ১৯৬৭ সালে। এর কয়েক বছর পর দ্বিতীয়বার প্যারিসে থাকাকালীন, ১৯৬৪ সালে। থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড আমাদের দেশের লোকনাট্য, যাত্রার মতোই অভিনেতা ও দর্শকের সমান অংশগ্রহণে অভিনীত হয়। আমাদের দেশজ অভিনয় ধারার

সঙ্গে সাজুয্য দেখে অভিভূত বাদল সরকার ২১.২.৫৮-তে মনুকে লেখা একটি চিঠিতে বাদল সরকার লিখেছেন—

> '' 'থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড' আমাদের দেশের যাত্রার মতো মাঝখানে চত্বরে হয়, চারিদিকে দর্শকরা বসে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের অত্যন্ত কাছে। পর্দা নেই, দৃশ্যপট নেই। ... বিনা উপকরণে শুধু অভিব্যক্তি আর অভিনয় দিয়ে দু'ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়ে রেখে দিলো। প্যাশান্ এমনভাবে অভিনয়ে ফোটানো যায় আমার ধারণা ছিল না।''[১১৫]

এই চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দেশজ লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিকটা তিনি জানতেন, কিন্তু এই আঙ্গিক যে এভাবে থিয়েটারে প্রয়োগ করা সম্ভব তা তিনি থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড দেখে প্রথম বুঝতে পারলেন। প্যারিসে দ্বিতীয়বার এই একই পদ্ধতির থিয়েটার দেখে তিনি বুঝেছেন লোকনাট্য যাত্রা আঙ্গিকের মাধ্যমেই দর্শকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্ভব। ১৬.১২.১৯৬৪ সালের একটি চিঠিতে সেই উপলব্ধির কথা জানিয়ে মনুকে লিখেছেন—

> ''এবার মনে হলো, প্রচলিত স্টেজের থেকে এই মাধ্যমে দর্শকদের অনেক বেশি নাড়া দেওয়া যায়। সেট নেই, সাজসজ্জা নেই। তিনটে কেঠো টেবিল, ছ'টা কেঠো চেয়ার, দু'চারটে কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ মনে হোলো কয়েকটা জীবন্ত লোককে দেখছি। ... অভিনেতাদের দর্শকের এতো কাছে আসা যে সম্ভব, আগে যেন ধারণা ছিল না।''[১১৬]

এই অভিজ্ঞতাই আমাদের মনে হয় তাঁকে এদেশের লোকনাট্যে , যাত্রার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। আর সেই আগ্রহ থেকেই জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ (জুন, ১৯৭১-মে, ১৯৭৩)-এর সৌজন্যে 'থিয়েটার অফ সিন্থেসিস অ্যাজ এ রুরাল আরবান লিঙ্ক' প্রকল্পের কাজ শেষ করেন। গ্রাম-শহরের থিয়েটারের এই সম্বয়ের কাজ করতে গিয়ে লোকনাট্য, যাত্রার মতো দেশজ অভিনয় ধারার সঙ্গে বাদল সরকারের একটা সংযোগ তৈরি হয়। বাংলার ছৌ, গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতি লোকনাট্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। শুধু তো বাংলা নয় বাংলার বাইরেও যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানকার লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পরিচিত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের নৌটঙ্কি, বিহারের তামাশার মতো যাত্রাঙ্গিকের সঙ্গে। মণিপুরে গিয়ে তিনি ওয়ার্কশপ করেছেন আর মণিপুরী নৃত্য দেখেছেন এবং তার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার আসামে গিয়ে বিহুর মতো জনপ্রিয় লোকনৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের সহকর্মী দীপঙ্কর দত্ত তাই লিখেছেন—

''একটা অন্যরকমের ইন্টার‍্যাকশন। আমরা তোমাদের নাটক শেখাচ্ছি, তোমরা আমাদের নাচটা শেখাও।''[১১৭]

এভাবে বোধ হয় তিনি প্রথমনাট্য অর্থাৎ লোকনাট্যের সঙ্গে একটু একটু করে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। কীভাবে তিনি লোকনাট্যকে তাঁর থিয়েটারে প্রয়োগ করেছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

''ডাইরেক্টলি নয়। ভাসাভাসা, একটা ধারণা থেকে করেছি। কখনও এগুলো দেখেছি, কিছুটা জানি, কিছুটা ধারণা, সব মিলে একটা আদল গড়ে তুলেছি। তাতে কোনো নাড়া বেঁধে শিক্ষার অভিজ্ঞতা নেই।''[১১৮]

বাদল সরকার এখানে স্পষ্ট করেই বলেছেন লোকনাট্যের মতো দেশজ অভিনয় ধারার সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক না থাকলেও তিনি তৃতীয় থিয়েটারে তার প্রয়োগ করেছেন। যার প্রথম প্রচেষ্টা এ বি টি এ হল ঘরের নির্মিত অঙ্গনমঞ্চে ২৪ অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রি: 'সাগিনা মাহাতো' যাত্রার মতোই চারিদিকে দর্শক বসিয়ে মাঝখানে একটা জায়গা বের করে শুরু করলেন অভিনয়। বাদল সরকার লিখেছেন—

''দর্শকরা মোটামুটি চারদিক ঘিরে বসেছিলেন। আমরা তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যেত তাঁদের। মধ্যে মধ্যে তাঁদের পাশে, তাঁদের পিছনে গেছি।''[১১৯]

এই আঙ্গিক তো আমাদের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিক। বাদল সরকার সেই আঙ্গিককেই এখানে প্রথম ব্যবহার করলেন। শুধু তাই নয়, সময় যত এগিয়েছে বাদল সরকার তত বেশি লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিককেই ব্যবহার করেছেন তাঁর তৃতীয় নাট্যে। অঙ্গনমঞ্চের পর তিনি যখন বাঁধামঞ্চের বাইরে খোলা আকাশের নিচে সুরেন্দ্রনাথ পার্ক (কার্জন পাকে) তাঁর থিয়েটারকে নিয়ে গেলেন তখন সেটা অরো বেশি স্পষ্ট হল। আর কোনো নির্দিষ্ট হল ঘর থাকল না। একেবারে দিনের আলোয়, হাজার হাজার দর্শকের মাঝে শুরু করলেন নাট্যাভিনয়। 'মিছিল', 'স্পার্টাকুস', 'মুক্তমেলা' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সেই আঙ্গিকের ব্যবহার করলেন। থিয়েটার মানে তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা আলোকিত আয়তক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা দর্শকের অন্ধকারে সন্নিবেশ নয়, প্রসেনিয়ামের মাপা মঞ্চ নয়, থিয়েটার হতে পারে দিনের আলোয়, যেখানে দর্শক সেখানে পৌঁছে যাবে থিয়েটার। এই ধারণারই এবার যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটল তাঁর নাট্যে। সুতরাং এটা বলতে অসুবিধা নেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের মূলে রয়েছে আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিক। যেখানে অভিনেতা-দর্শকের একটা গভীর সংযোগের মাধ্যমে অভিনয়টা সম্পন্ন হয়। বাদল

সরকার যে মুক্ত থিয়েটারের কথা বলেছেন, এদেশের লোকনাট্য প্রথমাবধি সবদিক থেকে মুক্ত। মঞ্চের জাঁকজমক থেকে মুক্ত, দৃশ্য, স্পষ্ট-লাইট থেকে মুক্ত, উন্মুক্ত মাঠে, রাতে কিংবা দিনের আলোয় যেখানে সেখানে লোকনাট্য অভিনীত হতে পারে। সেখানে দর্শকের টিকিট কেটে প্রবেশের ব্যাপার নয় তাই আর্থিক দিক থেকেও লোকনাট্যমুক্ত। অভিনয় চলাকালীন কখনো কখনো অভিনেতা যখন চাদর পেতে ধরেন দর্শকের কাছে, তখন দর্শক খুশি হয়ে যা দেন সেটা অভিনেতা সংগ্রহ করেন নেন। প্রাচীনকাল থেকে এই পদ্ধতিতেই কীর্তন, পালাগান গ্রামের সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে আসছে। বাদল সরকার এই শ্রেণির দর্শকের কাছেই হাজির হয়েছেন তাঁর নাটক নিয়ে। আর বেছে নিয়েছেন সেই চিরপ্রচলিত লোকনাট্য, যাত্রার আঙ্গিককে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক অমিয় দেব বাদল সরকারের যে মূল্যায়ন করেছেন এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''... বাদল সরকার প্রসিনিয়ামে ক্লান্ত হয়ে আপন ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে চাইছিলেন না, আপন ভূমিকেই আরো নিবিড় করে পেতে চাইছিলেন।''[১২০]

এদেশের মানুষ, এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতই তাঁকে নিয়ে গেছে লোকনাট্য, যাত্রার দিকে। শুধু অঙ্গনমঞ্চ কিংবা মুক্তমঞ্চের আঙ্গিকেই নয়, নাটক রচনাতেও বাদল সরকার বারবার ফিরে গেছেন আমাদের দেশের লোকনাট্যের বিষয়বস্তুতে। অবশ্য লোকনাট্যের বিষয় যখন তিনি তাঁর নাট্যে তুলে আনছেন তখন সেটা আঙ্গিক হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের এই সংযোগ লক্ষ করে নাট্যব্যক্তিত্ব মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক আলাপ চারিতায় বলেছেন—

> ''আমার কেন জানি মনে হয় যে বাদলদার যে-নাটক— এই শেষের দিকের নাটকগুলোর কথা আমি বলছি, *ভোমা*/ইত্যাদি আরও অনেক নাটক আছে— সেখানে বাদলদার নাটকের যতটা লোকনাটকের দিকে ঝোঁক— মানে দূরত্ব বজায় রেখে— যতটা তিনি লোকনাটকের দিকে হেলে আছেন, ততটাই তিনি প্রোসিনিয়াম নাটক থেকে দূরে আছেন।... অর্থাৎ তিনি প্রথম থিয়েটারকে ত্যাগ করে চলে এসে, দ্বিতীয় থিয়েটারকে ত্যাগ করে বলে এসে, প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন সম্পর্ক তিনি রক্ষা করেছেন, এইরকম আমার একটা মনে হয়।''[১২১]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুধাবন যে কতটা সঠিক তা বাদল সরকারের কয়েকটি নাটকের উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায়। যেমন তাঁর 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'ভানুমতীকা খেল', 'রূপকথার কেলেঙ্কারী', 'ভোমা', 'ভুল রাস্তা'-র মতো নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' (১৯৭৪)

লোকনাট্যের আঙ্গিকে লেখা। পাঁচালীর ঢঙটি এখানে নেওয়া হয়েছে। লোকজীবনের কাহিনি থেকেই নাটকটি গড়ে উঠেছে। কবি গানের ঢঙেই কবির লড়াই-এর চাপান-উতোর জুড়ে দিয়ে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—

''পচা।। ...বলি ওহে কবির।

একটি কথা শুধাই তোমায় দাও দেখি উত্তর।

খুড়ো।। একটা কেন, দশটা শুধাও না! (গান: পাঁচালীর সুর)''[১২২]

বোঝাই যাচ্ছে একেবারে কবিগানের ঢঙে এই সংলাপগুলি চরিত্রের মুখে বসিয়ে দিয়ে নাটকটি রচিত এবং সেইভাবেই অভিনীত হয়েছে। এই একই আঙ্গিকে রচিত 'ভানুমতীকা খেল' নাটকটি। এই নাটকে কবিগানের ঢঙে সঙ্গে রাস্তায় দেখানো মাদারিকা খেল-এর মজাটা জুড়ে দিয়ে নাটকটি জমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'রূপকথার কেলেঙ্কারী' নাটকটিও কবিগানের আঙ্গিকে রচিত এবং অভিনীত। এরপর আবার রূপকথার গল্পের আঙ্গিকে লেখেন 'হট্টমালার ওপারে' (১৯৭৭)। আর এই লোক-আঙ্গিকের চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখি তাঁর 'ভুলরাস্তা' (১৯৯২) নাটকে। একেবারে দেশজ লোক-আঙ্গিকে নাটকটি রচিত ও অভিনীত হয়। এইসব নাটকে লোক-আঙ্গিকের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দর্শন চৌধুরী তাই লিখেছেন—

> ''লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'ভানুমতিকা খেল', 'রূপকথার কেলেঙ্কারী'-এইসব নাট্যরচনা ও প্রযোজনার পথ রবেয়ে তিনি যখন 'ভোমা' কিংবা 'হট্টমালার ওপারে' পেরিয়ে 'ভুল রাস্তা'য় এসে পৌঁছান, তখন দেখি সেখানে গঠনের বা আঙ্গিকের এবং বিষয় বিন্যাসের বুদ্ধিগ্রাহ্য কৌশল ছেড়ে একেবারে লোককথার আঙ্গিকে, লোকজীবনের পরম্পরায়, কখনও রূপকথার আশ্রয়ে নাট্যভাবনা উপস্থিত করতে থাকেন।''[১২৩]

আসলে বাদল সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল জনসংযোগ। আর এই পথেই যে তা সম্ভব সেটা তিনি অনুভব করেছেন। তিনি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটার করতে চেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কাছে লোকনাট্যের প্রতি যে আকর্ষণ তাতে করে ঐ আঙ্গিকের মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ ও সুবিধাজনক। অতিচেনা, স্বাভাবিক জনজীবনের ঘটনা নিয়ে তিনি দর্শকের কাছে হাজির হয়েছেন। যেমন— লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'ভানুমতীকা খেল', 'রূপকথার কেলেঙ্কারী', 'ভোমা', 'ভুলরাস্তা' কিংবা 'চড়ুইভাতি' (১৯৯৪) এইসব নাটক বলার সহজ পদ্ধতির জন্য দর্শকের অনুভবের মধ্যে সোজা ঢুকে যায়। অদ্রীশ বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''এই নাটকগুলির প্রত্যেকটি যে লোক-আঙ্গিকে, তা নয়, কিন্তু লোক-আঙ্গিকের

চর্চা বাদলবাবুকে সেই সহজ পথটা, অন্তত নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তৈরি করে দিয়েছে। এখানেই তাঁর পরম সিদ্ধি।”[১২৪]

এইখানে এসে অনেকের মনে হতে পারে— মনে হওয়াটাই হয়ত স্বাভাবিক, থিয়েটার নিয়ে বাদল সরকারের এতদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল শেষে কিনা মিলে গেল লোকনাট্যে? তাই যদি হবে তাহলে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার কী ছিল। সরাসরি লোকনাট্যের মতো গ্রামীণ থিয়েটারই তো তিনি করতে পারতেন। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি বাদল সরকার চাইলেই গ্রামীণ থিয়েটার তুলে আনতে পারতেন না। তিনি আদ্যন্ত শহরে লালিত। বাদল সরকার গ্রামীণ থিয়েটারের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। দ্বিতীয় কথা হল, লোকনাট্য বা দেশজ অভিনয় ধারার আঙ্গিকের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র থিয়েটার। বাদল সরকার আসলে লোকনাট্যের রিচুয়াল বা আচারধর্মিতাকে তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে ব্যবহার করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন থিয়েটারের উৎসমূল। বাদল সরকার বলেছেন—

> ‘‘রিচুয়ালে নাট্যানুষ্ঠানটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। যেহেতু দর্শকের সক্রিয় ভূমিকা এই থিয়েটারের প্রধানতম গুণ, সেই হেতু নাট্যাভিনয়কে নাট্যানুষ্ঠান থেকে খুব একটা আলাদা করা যায় না। সেখানে একটি বিশিষ্ট অভিনেতৃগোষ্ঠী যদি থাকেও, তবে তাদের ভূমিকা হোলো দর্শককে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করা।”[১২৫]

এরপর তিনি বলেছেন—

> ‘‘লোকনাট্যে দর্শকের ভূমিকা যথেষ্ট সক্রিয়, কারণ দর্শকের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেওয়া লোকনাট্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং সেই কারণে নাট্যানুষ্ঠানই লোকনাট্যে সবচেয়ে বড়ো কথা।”[১২৬]

বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিকে সেই রিচ্যুয়ালের স্তরেই উন্নীত করতে চেয়েছেন আর এটা করতে গিয়েই লোকনাট্যের আঙ্গিককে ব্যবহার করেছেন। দেশের শ্রমজীবী, মেহনতি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ সাধনই যাঁর দার্শনিক ভিত্তি, সেই সব মানুষের সংস্কৃতিকে তাঁদের রিচ্যুয়ালকে তো তাঁকে জানতেই হবে। স্বাভাবিক কারণে লোক উপাদান তাঁর নাট্যে আসবে। বাদল সরকার তাই লোকনাট্যের আঙ্গিক আশ্রয় করে নাটকও লেখেন, কথকতার ঢঙে। পাঁচালীর ঢঙে, ‘লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকের এমন নাম ব্যবহারও দ্বিধা করেন না। কিন্তু এই গ্রহণ তাঁর অন্তরে অনুকরণ হয়নি তা কখনো। বাদল সরকার যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি যুগগত সমস্যাকে যুক্তির

আলোয় বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কাজ সামাজিক অর্ধসত্য ও অসত্যগুলোকে তুলে দেখিয়ে দেওয়া। লোকনাট্যে যে 'দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি'[১২৭] আছে, ধর্মের যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় এবং তার ভেতর সংস্কারগুলোকে আঁকড়ে ধরার বিষয় থাকে, অনেকক্ষেত্রে যে মিথ্‌গুলো মানুষের জীবনে অমোঘ নিয়তি হিসেবে বাসা বাঁধে সে বিষয়ে বাদল সরকার তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল। অনেক সময় লোকনাট্যের আঙ্গিকই কেবল নয়, বিষয়কে গ্রহণ করেও তিনি অন্যমাত্রায় নিয়ে যান। ফলে লোকনাট্যের বিষয় তখন বাদল সরকারের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আসে অর্থাৎ ঐ বিষয়কে গৌণ করে অথবা ঐ বিষয়ের সাহায্যে মূলত যুগসমস্যায় ঢুকে পড়েন। 'ভুলরাস্তা' নাটকে তাই গল্প বলিয়ে ভিক্ষা করা চরিত্রটি রাজা-রাণীর গল্প দিয়ে শুরু করে বটে কিন্তু তার মধ্যে যেভাবে কমিশন খাওয়া বোফর্স প্রসঙ্গ এসে পড়ে তখন সেটা আর রাজা রাণীর গল্প থাকে না। শেষপর্যন্ত রাজপুত্রকে ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়ে কাঠ কুড়ানী মা-ভাইয়ের সঙ্গে এক করে রাজা-রাণীর গল্পকেই প্রত্যাখান করে এ নাটক। 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' নাটকে কবিগানের চাপান উতোরের ঢঙে নাট্যকাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে কবিগানের মতো আক্রমণ প্রতি আক্রমণের তীব্রতা নেই। কারণ নাটকের বক্তব্য-বিষয় একেবারে ভিন্ন। এই নাটকের পচাও খুড়ো দুটি চরিত্র। খুড়ো কোন সম্পর্ক বোঝাতে নয়, খুড়োর কলের মতো এই গণতন্ত্রের সিস্টেমগুলোকে ব্যঙ্গ করা হয়। খুড়ো তাই এই সিস্টেমের সমর্থনে সাওয়াল করে, অন্যদিকে এই সিস্টেমের শিকার হয়ে পচতে থাকা অতি সাধারণ মানুষ 'পচা' তার পেটের টানে প্রশ্ন করে। এই ভাবেই নাট্যকার লোকনাট্যের আঙ্গিকের ভেতরেই বুনে দেন তাঁর দর্শন এমনভাবে যা তাকেই অতিক্রম করে ভিন্ন নাট্যমাত্রা আনে। এখানেই বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার লোকনাট্য থেকে স্বতন্ত্র।

বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার আসলে বহুকিছুর সিন্থেসিস জাত একটি বিকল্প থিয়েটার। আমরা বুঝতে পারি প্রচুর অভিজ্ঞতার সিন্থেসিসের ফলেই তাঁর নিজস্ব দর্শন প্রকাশের উপযোগী একটা ফর্ম নির্মিত হয়। যে ফর্মের মাধ্যমে বাদল সরকার তাঁর বক্তব্যকে কনটেন্ট হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই কারণে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের ফর্ম অনেক কিছুর সঙ্গে মেলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মেলে না। এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''অনেক সূত্র থেকে যে সমস্ত জিনিস পেয়েছি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কিছু ঘটেছে। অর্থাৎ কোনটাই যাকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া বা 'গ্রাফ্টিং' বলে তা আমি করিনি।''[১২৮]

যেখানে যেমন পেরেছেন তিনি যেন মণিমুক্তা সঞ্চয়ের মতো করে সঞ্চয় করেছেন নাট্যকলার বিভিন্ন কৌণিক মাত্রা ও আঙ্গিক। গ্রোটোস্কি, জুলিয়ান বেক, জুডিথ ম্যালিনা, রিচার্ড শেখনারদের

ভাবনা বহন করে বাদল সরকার তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন আমাদের দেশের দেশজ লোকনাট্য, যাত্রাগানের আঙ্গিক। দেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বিষয়কে আত্মীকরণের মধ্যে দিয়েই বাদল সরকার এক ভিন্ন নাট্যনির্মাণে পৌঁছেছেন। সে নির্মাণ তাঁর একান্তন্ত নিজস্ব। যদিও তিনি বলেছেন— ''তৃতীয় থিয়েটার কোনও নতুন নাট্যশৈলীর পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নয়, এ থিয়েটার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন।''[১২৯] কিন্তু সেই সঙ্গে বলতে হয় ঐ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শনকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। থিয়েটার নিয়ে তাঁর এই নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলই হল তৃতীয় থিয়েটার। সেখানে অনেক কিছুর সঙ্গে মিল থাকলেও একটা স্বাতন্ত্র্য থেকে যায় যা একান্তভাবে বাদল সরকারকেই চিনিয়ে দেয়।

৫

বাদল সরকার তাঁর 'থিয়েটারের ভাষা' গ্রন্থে তৃতীয় থিয়েটার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান—

> ''... সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনই এই থিয়েটারের জন্মদাতা, এবং সেই কারণে বক্তব্যই এই থিয়েটারের উৎস এবং ভিত্তি। সেই অনুসারে তৃতীয় থিয়েটার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি, এবং এর প্রতিষ্ঠা একটা ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমেই হতে পারে;''[১৩০]

তৃতীয় থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি যে একটা ব্যাপক আন্দোলনেই সম্ভব এটা বাদল সরকার উপলব্ধি করেছেন। আমরা লক্ষ্য করি জন্মলগ্ন থেকে তৃতীয় থিয়েটার কোনো আন্দোলনের রূপ পায়নি। প্রসেনিয়াম থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিকল্প থিয়েটারের কথা বললেও তা কখনোই আন্দোলনের রূপ পায়নি। এ প্রসঙ্গে বিশাখা রায়, যিনি মীরা সরকার নামেই পরিচিত, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে বাদল সরকারের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বিশাখা রায় লিখেছেন—

> ''১৯৬৩ সালে এবং ইন্দ্রজিৎ লেখা হয়, বাকি ইতিহাস লেখা হয় ১৯৬৪-তে, *ত্রিংশ শতাব্দী*-র রচনাকাল ১৯৬৬, তথাপি রাজনীতিসচেতন নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলবার কোনো ইচ্ছা বাদল সরকার প্রকাশ করেননি।''[১৩১]

আমরা লক্ষ্য করি ১৯৭৩ সালে অঙ্গনমঞ্চে 'স্পার্টাকুস' কিংবা 'আবু হোসেন', 'সাগিনা মাহাতো'-র মতো শ্রেণিসচেতন নাট্যসৃজন করবার পরও তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। আসলে থিয়েটারকে একটা আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সক্রিয় রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান নেবার প্রয়োজন বাদল সরকার তখনও সেই অবস্থান নিতে পারেননি। একটা সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন ঠিকই কিন্তু পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শেষের পর বহুদিন বাদল সরকার প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বা সাংস্কৃতিক বামপন্থা থেকে নিরাপদ দূরত্বেই অবস্থান করেছেন। 'বাকি ইতিহাস',

'ত্রিংশ শতাব্দী' কিংবা 'পরে কোনো দিন' প্রভৃতি নাটকগুলিতে যুদ্ধবিরোধী, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারবিরোধী তাঁর প্রতিবাদী অবস্থান তুলে ধরেন এবং সেই মতো নাটকগুলি প্রযোজনা করেন। কিন্তু নিজের দেশের অর্থনীতি-রাজনীতিতে পুঁজিবাদী শোষণ, আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহের মতো গণ আন্দোলনকে দমণ করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির যে ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন ও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা তার বিরুদ্ধে তিনি সবর হননি। ১৯৭১ সালে লেখা 'থিয়েটারি থিয়েটার: অঙ্গনমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> ''...সত্যিকারের থিয়েটারি থিয়েটার করতে গেলে দর্শক এবং অভিনয়শিল্পীকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ থিয়েটারকে 'ঘনিষ্ঠ' করতে হবে। ঘনিষ্ঠ করা যায় দুটি উপায়ে । এক— প্রেক্ষাগৃহ ছোট করে, যাতে কোনও দর্শকই শিল্পীর থেকে বেশি দূরে না থাকেন; এবং দুই— শিল্পীকে দর্শকের মধ্যে নামিয়ে এনে, যেটা করাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল দর্শকদের চারিপাশে বসিয়ে মাঝখানে অভিনয় করা।''[১৩২]

বাদল সরকারের এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন দেখিনা। তখনও তাঁর তৃতীয় থিয়েটার দর্শক অভিনেতার ভাবের আদান-প্রদানকে ঘনিষ্ঠ করবার প্রয়োজনের গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। অঙ্গনমঞ্চে প্রবল সাফল্যে শতাব্দীর নাট্যকর্মীদের মধ্যে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তা ভাঁটা পড়ে। এমনকি শতাব্দীর যেসব নাট্যকর্মী ১৯৭৩ সালে স্পার্টাকুস-এর মতো নাটক তৈরি করে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আসলে তাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই শুধু শুধু শ্রম দিয়ে, সময় দিয়ে, বিনা পয়সায় বেশিদিন শতাব্দীর সঙ্গে থাকতে পারেননি। ফলে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন তখনও দূরঅস্ত। বরং অন্যরা চলে যাওয়ায় স্বভাবতই শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী তথা বাদল সরকার একটা বাস্তব সংকটের মুখে পড়ে যান। এই অবস্থায় শতাব্দীকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা তাঁকে ভাবতে হয়। শুরু হয় নতুন পথের সন্ধান। ঠিক তখনই সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ের একদল দিগভ্রান্ত রাজনীতি সচেতন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে বাদল সরকারের সংযোগ হয়। এইসব তরুণদের অনেকেই ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা বিপ্লবের চরমপন্থাকে জীবনের পাথেয় করে গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তারা ছিল নবীন স্বপ্নে ভরপুর। একটা তীব্র আবেগ তাদের চালিত করে। এই আবেগ ছিল সময়ের বাস্তব-অভিঘাত। তারা বিশ্বাস করেছিল পরিবর্তনের স্থায়িত্বে। তারাই নতুন শতাব্দীর আসল জোর। এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

''প্রসেনিয়াম থিয়েটারে আমাদের যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছিলাম, তখন যাঁরা ছিলেন, যাঁদের অভিনয়ের একটু নামটাম খবরের কাগজে রিভিউ-এ বেরোত— তাঁরা 'শতাব্দী'কে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আরও যাঁরা কোনোদিন থিয়েটার করবেনই না ঠিক করেছিলেন, মানে মাথাতেই ছিল না— ... আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিনয় করবার জন্য নয়— যে দল স্পার্টাকুস -এর মতো নাটক করে সেই দলের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকতে চাই-এবং তারাই কিন্তু ঐ নতুন 'শতাব্দী'র পুরো জোর।''[১৩৩]

রাজনৈতিক আন্দোলনে যে শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই শক্তি এবার নিয়োজিত হল এক ভিন্ন ধারার থিয়েটার নির্মাণের কাজে। নতুন শতাব্দীর এক কর্মী যিনি নকশালবাড়ি আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বাদল সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়িবছর একসঙ্গে রকাজ করেছেন সেই বিশাখা রায় লিখেছেন—

''সময় থেকে ঝলসে বেরোনো নকশালবাড়ি আন্দোলনের তেজ গিলে নিয়ে আন্দোলনের শক্তি সঞ্চারের পথ সেদিন খোলা হয়েছিল। থিয়েটারে অজানা দিক নির্দেশ করবার প্রত্যয়ে আমরা স্থির ছিলাম। সময়ের বৈশিষ্ট্যগুলি মিশে গলে আমাদের যাত্রাপথে। পথ হয়ে উঠল রাজনৈতিক।''[১৩৪]

সাফল্য-সার্থকতার হিসেবিপনায় এতটুকু মাথা না ঘামিয়ে একটা যথার্থ রাজনৈতিক আবেগে এই যে তরুণ-তরুণীরা যারা নকশালবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সংস্কৃতির অন্য অর্থ আবিষ্কার করেছিল তারাই তৃতীয় থিয়েটারকে একটা আন্দোলনে পরিণত করার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। বাধা পথ ভাঙতে একটা অতিরিক্ত এনার্জির প্রয়োজন হয়, সেটা বাদল সরকার দু'হাত ভরে নিয়েছিলেন অন্য প্রজন্মের রাজনীতি সচেতন এই তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে। বাদল সরকার তাঁর শিল্পসৃজনের নিভৃত পরিসরটা এইসব নবীনদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। ফলে রূপান্তর ঘটাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এক ঝট্‌কায় ছিঁড়ে ফেললেন পুরনো পরিচয়। নকশাল আন্দোলনে খুন হওয়া, পিষে যাওয়া নবীন প্রাণের আর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি। সেদিন তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন পরিবর্তন ছাড়া অন্য পথ তাঁর জানা নেই। নবীন প্রাণের উপস্থিতি সেদিন বাদল সরকার এবং তাঁর নাট্যদল শতাব্দীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সুস্পষ্ট ভাবে শতাব্দী এই সময় একটা পক্ষ নিয়েছিল, শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর নাগরিক মনন এই সময় শ্রেণি সংঘর্ষের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। বদলে যায় তৃতীয় থিয়েটারের গতিমুখ। ব্যক্তি বাদল সরকারও সেদিন স্থির করেছিলেন তাঁর অবস্থান। এই প্রথম তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক

মতাদর্শকে থিয়েটার চর্চার পুরোভাগে স্থাপন করলেন। এই রাজনৈতিক সংযোগই কিন্তু তৃতীয় থিয়েটারকে একটা আন্দোলনে পরিণত করেছিল। একটা রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সংযোগেই তৃতীয় থিয়েটার অন্যমাত্রা পায়। সত্তরের দশকের উত্তাল সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম গভীরতা। এই সত্য উচ্চারণ করতে গিয়ে বিশাখা রায় লিখেছেন—

> ''রাজনীতিই থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের অভিমুখ ছিল, রচনাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের অভিপ্রায় ছিল না।''[১৩৫]

এই রাজনৈতিক সংযোগের কারণেই মধ্যবিত্ত আশ্রয় বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দীকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। যুগে যুগে পিষে যাওয়া মানুষের চিৎকার, তাদের লড়াই, প্রতিবাদ জঙ্গলে-পাহাড়ে-ধান ক্ষেতের লড়াইয়ের একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার দায় সেদিন নিয়েছিল শতাব্দী। এই সময় থিয়েটারকে বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী প্রান্তিক মানুষের দরজায় বা খুন হয়ে যাওয়া নবীন নকশাল তরুণ হৃদয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। শুরু হল অনেকের সঙ্গে যৌথ পথচলা। পথ ভাঙার দুঃসাহসিক তেজে বাদল সরকার নিজেকে স্থিত করলেন। সেদিন বাদল সরকার এবং শতাব্দীর সদস্যরা ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা-নিরাপত্তা জলাঞ্জলি দিয়ে, দাঁত চেপে লড়াই করেছেন থিয়েটারকে প্রান্তিক মানুষদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একটা বিশেষ কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বাদল সরকার এই স্তরে পৌঁছেছেন। মূলতঃ 'মিছিল', 'ভোমা', 'বাসি খবর', 'ভাঙা মানুষ', 'মানুষে মানুষে' প্রভৃতি নাটকগুলির নির্মাণের মধ্য দিয়ে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই সব নাটকগুলির নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন গড়ে ওঠে। আমরা এবার সেই কর্মপ্রবাহের আলোচনা সূত্রে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের একটা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন প্রক্রিয়ার প্রথম প্রচেষ্টা হল 'মিছিল' নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৪-এর জানুয়ারি। এই নাটকটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন—

> ''সত্তর দশকের প্রথমে কোলাজে আঙ্গিকে কলকাতার ওপর একটা নাটক তৈরির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল। যেহেতু কলকাতা 'মিছিল নগরী' তাই যথাযথ নাম হিসেবে ওই নাটকটি তৈরি করার উপযুক্ত পথ হিসেবে 'মিছিল' নামটাই আমার উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। ঠিক তার আগের কয়েক বছরে বহু মানুষ কিশোর-কিশোরী পুলিশের হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে পশুর মতো নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল। প্রত্যেক দিন খুন হয়ে যাওয়া একটা লোকের ছবি তাই আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। আর সম্ভবত চরিত্রটিতে নিজেকে ভেবেই একটি বৃদ্ধ

বিদূষকের অস্পষ্ট ধারণা আমার মনের মধ্যে তৈরি হল।”[১৩৬]

সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতই যে ‘মিছিল’ নাটকের প্রেক্ষাপট, সেই বিষয়টি তিনি এখানে স্পষ্ট করেছেন। মিছিল নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন ১৯৯২ সালের দেশ পত্রিকায় সুরজিৎ ঘোষকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন—

> ‘‘... ‘মিছিল’ নাটক যখন লেখা হয়, যাতে একটা ছেলে প্রত্যেক দিন মরছে, এটার সঙ্গে ঐ ৭০-৭১ সালের সালের ঘটনাগুলোর যোগ খুবই প্রকট, ...।”[১৩৭]

সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে শহর কলকাতার বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, সাংস্কৃতিক কর্মী, সকলেই কম-বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। সংবেদনশীল মানুষদের প্রতিক্রিয়া সেদিন ব্যক্ত হতে শুরু করেছিল। ‘মিছিল’ নাটক খুব প্রত্যক্ষভাবেই শহরের অভীপ্সার সঙ্গে যুক্ত। নকশাল আন্দোলন দমন করবার জন্য যে নৃশংস সন্ত্রাস ঘটেছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিল শহরের মানুষ। আঁতকে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জমাট বাঁধা ভিড়। কারণ এই তাণ্ডবলীলার কোনো আচ্ছাদন ছিল না। শহরের রাজপথে খুন হওয়া লাশ পড়ে থাকত। আপাত বিরোধহীন সমাজমন ধাক্কা খায়। একটা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এই সময় তৈরি হয়। তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন ও ‘মিছিল’ নাটককে এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত করেই বুঝতে হবে।

‘মিছিল’ নাটকে আছে এক ‘বুড়ো’র নিভৃত কণ্ঠস্বর। যখন সে খুব ছোটো ছিল জানতে চেয়েছিল অদৃশ্য হওয়া মোড়ের পর কী আছে। ‘খোকা’ তাকে জানায় মোড়ের পর স্তূপ হয়ে পড়ে আছে খুন হওয়া দেহ। এর মধ্যে কোন কাল্পনিক তথ্য নেই। সত্তরের দশকে লাগাতার নকশালপন্থীদের ধরে ধরে রাস্তায়, জেলে, সংঘর্ষে খুন করা হয়েছে। পথঘাট ভরে গিয়েছিল তাদের রক্তে। খুন হওয়া লাশ নির্লজ্জভাবে মাটিতে পড়েছিল। ‘ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ’ গ্রন্থে বর্ষীয়সী স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণী ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> ‘‘১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে একের পর এক পাঁচটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সংবাদপত্র অনুযায়ী এবং পুলিশি ভাষ্য অনুযায়ীই এই গণহত্যাকাণ্ডগুলির যাঁরা শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই ‘নকশালপন্থী’ অভিহিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সভ্য বা সমর্থক। ... এটাও পরিষ্কার যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এইসব নকশালপন্থীরা আততায়ীর হতে নিহত হয়েছেন।”[১৩৮]

সময়ের এই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই ‘মিছিল’ নাটক শক্তিশালী। নাটকের

শুরুতেই দপ করে আলো নিভে যায়। মনে হয় যেন সবাই বিভ্রান্ত, সবাই সন্ত্রস্ত। ভয়ানক এক বিপদ যেন ছেয়ে ফেলছে চারিদিক।

''এক।। কী হলো, আলো নিভে গেলো কেন?

দুই।। ফিউজ হয়ে গেলো নাকি সব?

তিন।। লোড্ শেডিং। এ যা হয়েছে না? প্রত্যেক দিন—

চার।। না না, সাবোতাজ্-কেউ তার কেটে দিয়েছে—

পাঁচ।। সাবধান! এই কিন্তু ছিনতাইয়ের মওকা—

... ...

ছয়।। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, এ কী হলো?

[হঠাৎ একটা গগণভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হল যেন।]''[১৩৯]

নাটকের 'খোকা' এক নাগাড়ে বলে চলেছে—

''খোকা।। আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে এখানে। আমি খুন হয়েছি। আমি!

আমি! এই যে-আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে। ... আমি! এই যে

এখানে— আমি— খুন হয়েছি— মরে গেছি— রোজ খুন হই—

রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ—

[...গগনভেদী আর্তনাদে ফেটে পড়লো, পথে লুটিয়ে পড়লো খোকা।...]''[১৪০]

সমগ্র মিছিল জুড়ে দেখা যায় 'খোকা'কে খুঁজে বার করবার টান টান উত্তেজনা। সন্ত্রাসের হিংস্র কণ্ঠস্বর হুংকার দিয়ে বলে—

''কোটাল।। (প্রচণ্ড ধমকে) চোপ!

[সবাই থেমে গেলো একসঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।''[১৪১]

শাসকের আগ্রাসী হুংকার স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল মিছিলের ধ্বনি। যুগে যুগে এটাই প্রতিষ্ঠানের মুখ। সময়ের গর্জন বারবার চাপা দেবার চেষ্টা চলে। নাটকে দেখা যায় অনৈতিক পীড়ন দমবন্ধ করে দিয়েছে মানুষের। কোটাল হুংকার দিয়ে বলে, 'বাজে কথা! মিথ্যে গুজব! বাড়ি যাও সব!'[১৪২] ক্ষমতাকাঠামোর এই হিংসা সেদিন 'খোকা'রা সহ্য করতে চায়নি। প্রভুর গুণ আছে, শক্তি আছে এই যুক্তিতে কোটাল বলীয়ান। 'খোকা' গ্রাহ্য করেনি এই দাপট। 'মিছিল' ছিল সেই খোকাদের প্রতিরোধের ভাষা, প্রতিবাদের সংকল্প। 'খোকা' শাসকের চোখে চোখ রেখে গর্জন করে বলে—

''আমি খুন হয়েছি, রোজ খুন হচ্ছি, রোজ খুন হবো— এটাই আসল কথা।

রাতের অন্ধকারে, দিনের গোলমালে, প্রত্যক দিন সে কথাটা তোমরা চাপা দেবার চেষ্টা করো। কিন্তু হবে না! আমি দেবো না চাপা দিতে! আপনারা দেবেন না চাপা দিতে!"[১৪৩]

নকশাল আন্দোলন সফল হয়নি। তবুও এই শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। দেশ জুড়ে উঠেছিল আলোড়ন। 'মিছিল' নাটকের পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে সেই রাজনৈতিক সক্রিয়তার কোলাহল। ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই কলকাতার কার্জন পার্কে যেখানে নিয়মিত সমাজ সচেতন নাটক চর্চা করা হত সেখানে প্রবীর দত্ত নামক এক তরুণ দর্শককে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করে হত্যা করে। ''কারণ, সে সব নাটক করেছিল অতিবিপ্লবী কিছু নকশালপন্থী দল, যারা অস্ত্র ধরার ডাক দিয়ে ডেলিবারেটলি ১৪৪ ধারা ভাঙে। ... পুলিশ মাঠে ঢুকে অত্যন্ত সাধারণ দর্শকের উপর লাঠি চালায় এবং প্রবীর দত্তকে খুন করে।"[১৪৪] এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা বাংলার মানুষ সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সম্মিলিতভাবে কার্জন পার্কে 'মিছিল' নাটকটি অভিনয় করেন। এই নাটকটিকেই সেদিন সমবেতভাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'মিছিল' নাটকটিই ছিল অন্যতম হাতিয়ার। প্রতিটি নাট্যকর্মী সেদিন অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তি কী, কেনই বা মিছিল বারবার ঘুরে আসে। একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি নাট্যকর্মী বিদ্রোহের সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। সেদিন খুন হয়ে পড়েছিল 'খোকা'দের লাশ। তারা সেই স্পিরিটটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। পুরো নাটকটাই ঘুরে ঘুরে অভিনয় করা। মিছিল কখনো দর্শকের ঘাড়ের ওপর, কখনো দূরে। সমগ্র পরিকল্পনায় একটা জীবন্ত ভাব যুক্ত হয়েছিল। সমস্ত নাট্যগোষ্ঠী পরিবর্তনের দর্শনে আস্থা রেখেছিল বলেই এই পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছিল। 'মিছিল' নাট্যসৃজনের কথা বলতে গিয়ে বিশাখা রায় তাই লিখেছেন—

> ''নাটকের শুরুতে দর্শকদের এক এক করে হাত ধরে প্রবেশ করিয়ে একটা আঁকাবাঁকা বেগের মধ্য দিয়ে পথ ঘুরিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হত। চমকে ওঠা দর্শক মুহূর্তে নিজস্ব ঘেরাটোপ থেকে বাইরে ছিটকে পড়তেন। ... *মিছিল* নাটকে 'খোকা'-র পর পর কতগুলি মৃত্যুদৃশ্য তৈরি করা হয়েছিল। নিরাভরণ, প্রায় নিঃশব্দ ছিল সেই দৃশ্য। 'খোকা' ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, 'খোকা' যুদ্ধক্ষেত্রে খুন হচ্ছে, 'খোকা' গ্যাসচেম্বারে দমবন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে— এগুলি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল সমগ্র শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর তন্ময় একাগ্রতা ও কল্পনাশক্তি। সেদিনের সমগ্র চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক দর্শনবোধ একটা মস্ত ভূমিকা

পালন করেছিল। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছিল।"[১৪৫]

বিশাখা রায় আরও লিখেছেন—

" 'খোকা'দের হারিয়ে যাওয়া সেদিন দগদগে ঘায়ের মতো লেপটে ছিল সমাজমনে। 'খোকা'দের পথভ্রষ্ট করবার নানা মতলব বাতাসে ঘোরে। চোখ নাচিয়ে, গলা ফাটিয়ে লোক দেখানো হয়। হত্যা করা হয়। দায়িত্ব নেবার সামাজিক প্রশ্নটা একেবারে সামনে এসে পড়ে। *মিছিল* নির্মাণ করে নাট্যকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, *মিছিল* অভিনয় করে নাট্যকর্মীরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, দর্শকরা গানের সুরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পুরো যাত্রাটাই ছিল রাজনৈতিক।"[১৪৬]

এই রাজনৈতিক আদর্শবাদের জোরেই 'রাতের অন্ধকারে, দিনের গোলমালে'[১৪৭], যে সত্যটা শাসক চাপা দিতে চায় সেই অভিসন্ধি শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে প্রতিহত করার শপথ নিয়েছিল। একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মিছিলের পরিক্রমায় নাট্যকর্মী থেকে দর্শক সকলেই সেদিন সামিল হয়েছিলেন। সেই পরিক্রমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিশাখা রায় লিখেছেন—

"... *নতুন বাড়ি*-র স্বপ্নগাথা গলা ফাটিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, রেল স্টেশনে, খোলা ড্রেন, বস্তির গলিতে বলে বেড়িয়েছিলাম। সাহস একটা জন্মেছিল। সেটাই ছিল আমাদের রাজনীতির শক্তি। ... পশ্চিমবাংলার কাপাসটুকুরী নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে *মিছিল* করতে যাওয়া হয়েছিল। নাটকের শেষে গানের সুর নিয়ে আমরা দর্শকদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম— একে একে সমস্ত নিরন্ন গ্রাম আমাদের সঙ্গে উঠে এল। ... আমরা হেঁটে চললাম। মিছিল উচ্চারণ করে—

বুড়ো।। কোথায় চললে?

খোকা।। মরতে। খুন হতে।

বুড়ো।। চলো, আমি তোমার পেছনে আছি।

খোকা।। পেছনে আছি মানে? পেছনে আছো কেন?

বুড়ো।। সামনে যাবার কথা ছিল। পারিনি। তার আগেই হারিয়ে গেছি। তাই পেছনে আছি।"[১৪৮]

সত্য এই স্বর। এই স্বর অন্বেষণ করাই ছিল তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের লক্ষ। একটা বিশ্বাস সেদিন তাদের মনে জন্মেছিল যে সত্যিকারের সত্যি মিছিল একদিন আসবেই। একদিন পৌঁছে

যাবেন নতুন বাড়ি'র ঠিকানায়। সেই বিশ্বাসেই মিছিল নাট্যসৃজন হয়েছিল।

সময় যত এগিয়েছে তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের তীব্রতা ততই প্রসারিত হয়েছে। ক্রমশঃ শহর ছাড়িয়ে থিয়েটারকে 'বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া'-র[১৪৯] সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী পৌঁছে গেলেন দেশের বৃহত্তর প্রান্তিক মানুষের দুয়ারে। শতাব্দীর নাট্যসৃজনে উঠে এল সেইসব প্রান্তিক মানুষের স্বর। যেমন— 'ভোমা' নাটক। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৫ সাল। নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। 'ভোমা' নাটক শুরু হয়েছে অন্যকে জানাবার দায়বদ্ধতা দিয়ে। ভোমা উচ্চারণ করে—

''এক । আমি জানি।

দুই । কী জানো?

এক । আমি জেনেছি। আগে জানতাম না।

তিন। কী জানতে না?

এক । অনেক অনেক দিন কেটে গেছে না জেনে। এখন জেনেছি।

চার । কী জেনেছো?

এক। অনেক কথা। অনেক অনেক কথা।

পাঁচ। কী কথা?

এক। সে কথা এখনো অনেকে জানে না। যেমন আমি আগে জানতাম না।

দুই। কী জানতে না?

এক। আমি বলতে চাই। যারা এখনো জানে না, তাদের বলতে চাই।

তিন। কী বলতে চাও?

এক। অনেক কথা। ভোমার কথা।

চার। কে ভোমা?''[১৫০]

বাদল সরকার ভোমা নাটকের মুখবন্ধ-এ জানিয়েছেন—

''সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাঙাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক তুষারবাবুর কাছে। ভোমার গল্প তাঁর কাছেই শুনেছিলাম।''[১৫১]

কী ছিল সেই গল্প? ভোমা'ই বা কে? ভোমা নাট্যসৃজনের উৎস কী? বিশাখা রায় লিখেছেন—

''...মাস্টারমশাই বলে চলেছেন সর্দারপাড়ার ভোমা-র গল্প। সে জঙ্গল হাসিল

করেছিল। বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। ভোমার বাপ, মা, ভাই কেউ তেঁতুলগোলা জল খেয়ে মরে গেছে, কাউকে কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে। ভাত নেই, চারদিকে শুধু নোনা জল। ... ভোমা ভাত খাবে বাবু' এই একটাই খরখরে চিৎকার ঢেকে ফেলল চারদিক। এরপর শুরু হয় আলোচনা। সম্মিলিতভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে কথাগুলো জরুরি, এই কথাগুলো ঘিরে-থাকা দর্শকদের জানাতেই হবে। ... 'ভোমা ভাত খাবে বাবু'— খরখরে চিৎকার যেন ঘরের দরজায় এসে ঘা দিচ্ছে। আমরা স্থির করলাম এই জানাকে প্রকাশ করতে হবে। আগ্রাসী ক্ষমতা কাঠমোকে ধাক্কা মারতে হবে।"[১৫২]

অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষের স্বর অনুসন্ধানই ছিল 'ভোমা' নাট্যসৃষ্টির মৌলিক তাগিদ। সত্তরের দশকের একদিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা অন্যদিকে বাংলার খাদ্য-আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন সেই সময়কার অনেক সংবেদনশীল মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। মূলতঃ গ্রাম-শহরের অনৈতিক বিভাজনের প্রশ্নটা নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। নগর কলকাতায় পাতাল রেল তৈরি হবে, না কৃষিতে তিনটি ফসল ফলানোর উপযোগী জলের ব্যবস্থা করা হবে, উন্নয়নের মাপকাঠি কি শুধুমাত্র শহরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে না, কৃষিপ্রধানদেশের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হবে? সত্তরের দশকে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘোরো' এই শ্লোগান মূলত প্রান্তিক মানুষের ভাতের অধিকারের প্রতি দিক নির্দেশ করে। নকশালবাড়ি আন্দোলন চলে আসা ধারণাগুলিকে সরাসরি নস্যাৎ করতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি সেই সময়ের নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন ভাবে হাজির হওয়ায় উত্তর খোঁজবার পদ্ধতিতেও নতুন সুর, নতুন বুদ্ধিমত্তা এবং দায়বদ্ধ আবেগ সংযোজিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হল। সমাজমন ও ব্যক্তিমন সেদিন দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ পেল না। এই দায়বদ্ধতাই বাদল সরকারসহ তাঁর দল শতাব্দীকে নিয়ে গেছে চব্বিশ পরগণার ভাদুরিয়া গ্রামে, সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে, ভোমার কাছে। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন চারদিকে খেতে না পাওয়া নিরন্ন ভোমাদের হাহাকার। তাদের কণ্ঠনালী ঘিরে দপদপ করছে ভাত খাবার আকাঙ্ক্ষা। তারা ''যুঁইফুলের মতো সাদা গরম ভাতের স্বপ্ন"[১৫৩] দেখে। কিন্তু ভাত জুটবে কীভাবে? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো অন্যায্য বিভাজন। ভোমা নাট্যসৃজনের মধ্য দিয়ে সেই বিভাজনের অন্যায্য আগ্রাসন তুলে ধরা হয়েছে।

''এক।। শুনুন শুনুন— আমি আজ আপনাদের একটা গল্প শোনাবো!

[গল্পটা চলতে থাকবে। ওরা নিজেদের তালে গুণগুণ করে গাইবে আর নাচবে।]

একটা ছোট্ট গ্রাম, গ্রামের নাম ভাদুরিয়া, অঞ্চল শিমুলপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, দেশ ভারতবর্ষ। গ্রামে আড়াইশো পরিবার, তার ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম, নব্বইটা পরিবারের কোনো জমিই নেই, তারা পরের জমিতে জন খাটে, দিনে চার টাকা মুজরি পায়। এক একটা পরিবারে পাঁচ ছয় দশজন পোষ্য, চার টাকা রোজে চাল জোটে না, গম, তা রুটি বানানো পোষায় না, জলে আটা গুলে নুন দিয়ে রাঁধলে কম আটা বেশিক্ষণ পেটে থাকে।..., আজকাল তবু নলকূপের কল্যাণে কিছু রবিশস্য গম বোরোধান হচ্ছে তাই ফাল্গুন থেকে বৈশাখও কিছু কাজ জোটে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্প, তা ডিজেল মেলে না, সার মেলে না, সারের দাম দ্বিগুন হয়ে গেলো, ...

দুই।। রাস্তায় জল জমছে প্রতি বছর, কলকাতা গ্রাম না শহর?

তিন।। কলকাতায় আজও কম্পোজিট স্টেডিয়াম হোলো না, ছি ছি ছি!

চার।। হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু নিয়ে খালি টালবাহানা, কবে কাজ হবে?

পাঁচ।। পাতাল রেল কলকাতায়-ভারতে প্রথম, কিন্তু হচ্ছে কই?

[প্রত্যেকে কথা শেষ করেই নাচে ফিরে যাচ্ছে।]

এক।। শুনুন শুনুন, আমার গল্পটা শেষ হয় নি। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু খুঁটি আছে তার আছে— আজ তিন বছর।... যদি ইলেকট্রিসিটি আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে— মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে...

দুই।। দ্বিতীয় সেতু— কবে হবে?

তিনি।। স্টেডিয়াম— কবে হবে?

চার।। পাতাল রেল— কবে হবে?

...

দুই।। দ্বিতীয় সেতু মাত্র ষাট কোটি টাকা—

তিন।। সি-এম-ডি-এ গর্ত খুঁড়ে মাত্র দু'শো কোটি টাকা—

চার।। পাতালরেল মাত্র তিনশো কোটি টাকা—

এক।। মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা, আমি হিসেব করে দেখেছি— ... দান চাই না, ধার দিন। ব্যাঙ্কের সুদে, চোদ্দ, পার্সেন্ট সুদে ধার দিন, ফসল তুলে সুদ শুদ্ধ শোধ করে দেবে চাষী, সোনা ফলে যাবে, ক্ষেতমজুর সারা বছর কাজ পাবে, মজুরি বাড়বে—"[১৫৪]

গ্রাম-শহরের এই অন্যায্য বিভাজন সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। গ্রাম-শহরের অসম বিভাজনের মাপকাঠিতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন

ভোমাদের ক্ষুধা ও প্রান্তিক মানুষের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করার। একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলেন পরিবর্তনের। শুরু হয়েছিল তুমুল এক কর্মযজ্ঞ। সরকারি পরিসংখ্যান, সমীক্ষা, নানা রিপোর্ট সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে, কৃষক, বিদ্রোহের নানা ইতিহাস অধ্যয়ন করা প্রান্তিক মানুষের বেঁচে থাকার মর্মান্তিক রাজনীতি, কৃষিপ্রধান অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তিটা কী তা অনুধাবন করার চেষ্টা— সবই ছিল এই সৃজন প্রক্রিয়ার অঙ্গ। ভোমা কে? কে ভোমা? এই অনুসন্ধানের মধ্যে প্রতিটি থিয়েটারকর্মী সম্মিলিত ভাবে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই সৃজনপ্রক্রিয়ায় সেদিনের প্রতিটি থিয়েটারকর্মী প্রান্তিক মানুষ ভোমার স্বর আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। তার জন্য সমস্ত দলকে একমুখী ও কঠোর পরিশ্রমী হতে হয়েছিল। দিনের পর দিন ধরে চলে বিভিন্নরকম ওয়ার্কশপ। প্রতিটি থিয়েটারকর্মীকে ভেঙেচুরে আবিষ্কার করতে হয়েছে নিজ পরিচয়। কেমন ছিল সেই সৃজনপ্রক্রিয়া? আবারও আমরা বিশখা রায়ের স্মৃতিচারণা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। কারণ এই সৃজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেছেন—

> ''শরীর ছিল আমাদের সম্পদ। আমাদের নাট্যসৃজনে দেহের পূর্ণ প্রয়োগ করা ছিল জরুরি। দেহবল্লরী আছড়ে পিছড়ে আমরা তৈরি করেছি ধান ক্ষেতে বয়ে যাওয়া হাওয়া, ভেঙে পড়ে যাওয়া যন্ত্র, বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে সর্বনাশ হয়ে যাবার কান্না, বোমার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া মাতা ধরিত্রী। বিকলাঙ্গ শিশুর মিছিল হানা দিয়েছে, ধাক্কা মেরেছে দর্শকদের স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া মুখে। কিছুই যেন বাদ দেওয়া হয়নি। এক অবিশ্বাস্য এনার্জি উৎসারিত হয়েছিল ভোমার অঙ্গন থেকে। এই শক্তিই দিকনির্দেশ করেছিল।''[১৫৫]

তিনি আরও লিখেছেন—

> ''পুরো প্রবাহটাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক। ... দীর্ঘ অনুশীলন প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যে আস্থা উৎসারিত হয়েছিল সেটাই থার্ড থিয়েটারের ভবিষ্যৎ গতিমুখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। থিয়েটারের ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। ভোমা সৃজন করা না গেলে ভিন্ন থিয়েটারের আন্দোলন কতদূর যেতে পারত সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে। বিরুদ্ধ স্বর ধরে রাখতে গেলে একটা শক্তির কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। ভোমা ছিল আমাদের শিকড়।''[১৫৬]

একটা তীব্র আবেগ সেদিন যুক্ত হয়েছিল এই সৃজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। থিয়েটারের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। ভোমার চোখে আগুনের ঝড় জাগাতেই হবে এটাই ছিল তাঁদের সেদিনের শপথ। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দী নাট্যদলের প্রতিটি কর্মী

সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন—

> ''হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পৃথিবীটার মালিক তো আমরা সবাই, তাই না ভোমা? আমরা সবাই যদি প্রাণপণে খেটে সব কিছু বানাতাম, বানিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে নিতাম, তাহলে ঐ আজব ছবিটা-যার জোরে ভোমা তোমার রক্ত আমরা কিনে খাই, আর যার অভাবে তুমি ভাত পাও না, ঐ আজব অশ্লীল ছবিটার পাট জন্মের মতো চুকিয়ে দিয়ে—আমি বোঝতে পারছি না ভোমা! শুধু বুঝতে পারছি—তুমি কুড়ুল হাতে উঠে না দাঁড়ালে এই বিষাক্ত গাছের জঙ্গল হাসিল হবে না ভোমা! আমার আবাদ, আমাদের আবাদ— আমাদের স্বপ্নের আবাদ—''[১৫৭]

এটাই ছিল সেদিনের সক্রিয় রাজনীতি। এই সক্রিয় চেতনাই শতাব্দীকে নিয়ে গেছে প্রান্তিক মানুষের কাছে। রূপান্তরের প্রতি সেদিন গভীর আস্থা রাখা হয়েছিল, ভোমা নাট্যসৃজন ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শতাব্দী নাট্যদলের কর্মীরা এটা বিশ্বাস করেছিলেন একদিন ভোমারা ঠিক রুখে দাঁড়াবে। শতাব্দীর এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে বিশাখা রায় খুব স্পষ্ট করে বলেছেন—

> ''সুস্পষ্ট ভাবে আমরা একটা পক্ষ নিয়েছিলাম, একটা বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন থেকেই আমরা স্বপ্ন আহরণ করেছিলাম। সাম্যবাদকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যুক্তিগতভাবেই বাদল সরকার বা থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দেশ কাল রহিত কোনো ব্যতিক্রম নয়। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর নাগরিক মনন শ্রেণি সংঘর্ষের স্বপ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।''[১৫৮]

এই রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণেই সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর গোটা নাট্যদল 'ভোমা' নাটক নিয়ে হাজির হয়েছে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে ভোমাদের বাড়ির উঠোনে। এইসব প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চনার কথা, তাদের ভাতের অধিকারের কথা তাদেরই সামনে তুলে ধরার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ীই ১৯৭৬ সালের ২১ মার্চ সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী 'ভোমা' নাটকটি প্রথম অভিনয় করে। এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সেদিন শতাব্দী লক্ষ্য করেছিল গ্রামের মানুষদের মধ্যে। শতাব্দীও সেই উন্মাদনায় এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বিশাখা রায় লিখেছেন—

> ''রাঙাবেলিয়া গ্রামের মাঝখানে খোলা মাঠ, কাদা দিয়ে পিটিয়ে একটা উঁচু জায়গা তৈরি করা হয়েছে। ওটাই অভিনয়ের স্থান। সামনে-পেছনে, ডানদিকে-বাঁদিকে গিজগিজ করছে মানুষের মাথা। ছেলে-বুড়ো-মা-বউ চারদিকে চুপ করে বসে আছে। গোগ্রাসে গিলছিল শহরের মানুষদের তৈরি

ভোমা নাটক। এই অভিজ্ঞতা ছিল তুলনাহীন। নিরন্ন জীবন্ত মানুষের উপস্থিতিই আমাদের মনে সাহস জুগিয়েছিল।"[১৫৯]

বিশাখা রায়ের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার গ্রামে ভীষণ ভাবে সফল হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল না থাকার কারণে বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদল শতাব্দীর পক্ষে গ্রামে গিয়ে নিয়মিত থিয়েটার করা সম্ভব ছিল না। কারণ দেশে তখন জরুরি অবস্থা (২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭) আধিপত্যবাদী ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল সেদিন। পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের কারণে বেশিরভাগ নাট্যদল মুক্তমঞ্চে অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। শতাব্দীও তখনকার মতো গ্রামে গিয়ে অভিনয় না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। গ্রামে অভিনয় বন্ধ করলেও শতাব্দী কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে শহরের অঙ্গনমঞ্চে তাদের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থিওজফিক্যাল সোসাইটির হলঘরটি ভাড়া নিয়ে অঙ্গনমঞ্চে আবার নিয়মিত অভিনয় শুরু করে শতাব্দী। ঠিক সেই সময় থেকে জরুরি অবস্থা উঠে যাওয়া পর্যন্ত বাদল সরকার প্রত্যেক শুক্রবার সেখানে শতাব্দীর অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে। 'ভোমা'র অভিনয় খোলা জায়গায় বন্ধ করে দিয়ে সেইসময় প্রজ্ঞানানন্দ ভবন ভাড়া নিয়ে বেশ কয়েকটি রবিবার অভিনয় করা হয়েছিল। যদিও তা ছিল অত্যন্ত গোপনে। দলের পরিচিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে অভিনয় করা হয়েছিল। তবু সেদিন ঘর ভরে গিয়েছিল। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দর্শকরাও সেদিন এই সৃজন প্রক্রিয়ার শরিক হয়েছিলেন। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"দর্শকদের দিক থেকে ওই সাড়া শুধু নাটকটার প্রযোজনার গুণে নয়, আসলে ওইরকম একটা সময়ে এরকম একটা নাটক ওভাবে অভিনীত হচ্ছে, সেটাও একটা বড় কারণ। একদিক থেকে বললে, ওই পরিস্থিতিতে দর্শকরা এই নাটক দেখাটাকেও একটা রাজনৈতিক কাজ বলে মনে করতেন।"[১৬০]

প্রত্যন্ত গ্রাম সেদিন হাজির হয়েছিল শহরের বাঁধানো দরজায়। ছোট কারখানা উঠে যাচ্ছে। জলের অভাবে ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্যালো মেশিন বসাবার পুঁজি নেই। তিন ফসলী জমিতে তিনবার চাষ করা যাচ্ছে না। সারের দাম ক্রমশ বেড়ে চলছে—এইরকম প্রতিটি প্রবণতার বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছে ভোমাকে খোঁজবার দায়। এই দায় সেদিন শতাব্দীর প্রতিটি নাট্যকর্মীর পাশাপাশি দর্শকরা নিয়েছিলেন। দর্শক-অভিনেতা সম্মিলিত ভাবে স্থির প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছিল—

"... চারিপাশে আগাছা পরগাছার বিষাক্ত জঙ্গল বেড়ে উঠছে। বিষ। বাতাসে বিষের গন্ধ। জিভে ভোমার রক্তের স্বাদ। ভোমার রক্ত খেয়ে আমরা হাসছি,

খেলছি, দুকষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ঝরছে, বিষগাছ বাড়ছে, আমার রক্ত, মানুষের রক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা— ... কিন্তু ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন। ভোমা উঠছে। ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে, শান দিচ্ছে। ... হাত শক্ত হচ্ছে ভোমার! সাঁড়াশি আঙুল কুড়ুলের হাতলে চেপে বসছে। ছেঁড়া চোখে বাঘমারা আগুন জ্বলে উঠছে! ভোমা উঠছে! ... মারো জোয়ান হেঁইও!"[১৬১]

সেদিন সমস্ত রকম অন্যায্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অভিনেতা থেকে সাধারণ দর্শক প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। একটা সক্রিয় রাজনৈতিক দর্শন থেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন এইসব প্রান্তিক মানুষেরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। এই অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াই তুলে ধরা হয়েছে 'ভোমা' নাট্যসৃজনে। তার জন্যেই তো শতাব্দীর কর্মীরা বারবার ছুটে গেছেন দুর্গম কাদা পেরিয়ে সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া গ্রামে। শতাব্দীর তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাসে ভোমা নাট্য সৃজন তাই 'একটা great leap forward।'[১৬২]

এই ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসৃজন হল 'বাসি খবর'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৮ সাল। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি প্রথম অভিনয় করে ৬ জুলাই, ১৯৭৯ সালে থিওজফিক্যাল সোসাইটির হল ঘরে। নাটকটির নাট্যসৃজন সম্পর্কে বাদল সরকার লিখেছেন—

"এই নাটকটা দলের মধ্যে সমবেত প্রয়াসের ফল। একেবারে শেষের দিকে, যা যা খবর ও লেখাপত্র যোগাড় হয়েছে এবং যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। এই নাটকে আমার অবদান বলতে যেটুকু তা নাটকের কাজ চলাকালীন বাকি সদস্যদের মতোই, পাণ্ডুলিপি লেখায় নয়। আর ঠিক এই কারণেই আমি 'বাসি খবর'-এর নাটককার নই, খুব বেশি হলে সম্পাদকমাত্র।"[১৬৩]

সত্তরের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বাদল সরকার নাট্যরচনার পাশাপাশি কোলাজ তৈরিতে মশগুল হয়ে পড়েন। নানা রঙের ছেঁড়া কাগজের টুকরো, আঠা মোছার ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন রকম কোলাজ নির্মাণ করতেন। ১৯৭৯ সালে ছেঁড়া কাগজ জুড়ে জুড়ে, আঠা মুছে মুছে একটা কোলাজ তৈরি করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'Faces of Man'-'মানুষের বহু মুখ'। কী ছিল এই কোলাজে? *Faces of Man* বিরাট কোলাজের মাঝখানে এক বিমর্ষ মানুষের মুখ। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে নানা মুখ, অন্য মানুষের মুখ। এরা কি অন্য মানুষের মুখ না কি একই মানুষের খণ্ড খণ্ড অবয়ব। বুঝি, কেন্দ্রের মুখ নিজেই ছড়িয়ে দিয়েছে তার নিজস্ব দিনযাপনের

ইতিকথা। ইতিহাসকে সে যেভাবে ভাবতে শিখেছে, চিনতে শিখেছে যেন সেই ইতিকথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রঙের ঠাসা বুননে। নিঃসঙ্গতা-বেদনা, ভয়-ক্রোধ, দম্ভ-হতাশা, উচ্চাশা-সন্ত্রাস যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে ছড়িয়ে থাকা নানা মুখের কোলাজে।"[১৬৪] বাদল সরকার যখন এই কোলাজ দলের সদস্যদের সামনে তুলে ধরলেন তখন তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা। শুরু হয় তীব্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দলের কোন কোন সদস্যের মনে হয়েছিল কোলাজে প্রদর্শিত মানুষের বোধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। যুগে যুগে পিষে যাওয়া মানুষের লড়াই এই কোলাজে অনুপস্থিত। শতাব্দী এই অসম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার দায় নিতে অস্বীকার করে। তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলন একটা বিশেষ দর্শনকে নিয়ে চলে। তাঁরা সেই সত্যের কাছে দায়বদ্ধ। সম্মিলিতভাবে সেদিন বাদল সরকারের কোলাজটা বর্জন করা হয়। যুক্তিসঙ্গত কারণেই এমনটা করা হয়েছিল। একটা প্রতিবাদী স্বর নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। 'ভোমা'র মতো আবার শুরু হল অনুসন্ধান, প্রান্তিক মানুষের স্বর অনুসন্ধান। এদেশে সংগঠিত হওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের উপাখ্যান Faces of Man কোলাজের সঙ্গে যুক্ত করে নির্মাণ করা হল আরেক ইতিহাস। 'বাসি খবর' নাটকের নির্মাণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বাদল সরকার লিখেছেন:

> ''আমরা কর্মশালা করতাম আর আলোচনায় বসতাম। সেইসব আলোচনায় আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতাম, আর উত্তরগুলো এমন সব সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দিত যার ওপর নাটকটা দাঁড়াবে। আমরা যদি মানুষের লড়াইকে কেন্দ্রীয় বিষয় করি তাহলে কি সাধারণভাবে বিদ্রোহকে দেখাব, নাকি ইতিহাসের কোনও নির্দিষ্ট বিদ্রোহকে তুলে নেব? উত্তর এল, একটা নির্দিষ্ট বিদ্রোহ। কোনটা? একজন বলল, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহ। পরামর্শ গৃহীত হল।"[১৬৫]

ইতিহাসের ঘটে যাওয়া সেই সাঁওতাল বিদ্রোহকে তুলে ধরবার জন্য শুরু হল অনুসন্ধান। আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কাহিনী তুলে ধরতে চলে নানা গবেষণা। এক্ষেত্রে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিছু গ্রন্থের সাহায্য নেন বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা। বিশেষ করে ধীরেন্দ্র বাস্কের 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস', সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের 'বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি সমকালীন সংবাদ পত্র থেকেও নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কারণ শুধুমাত্র সাঁওতাল বিদ্রোহের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া এই নাট্যসৃজনের উদ্দেশ্য ছিল না। সমকালীন সময়ের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কৃষক বিদ্রোহকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাদল সরকার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> ''... আমরা কি সাঁওতাল ও অত্যাচারীদের নিয়ে ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর একটা নাটক তৈরি করব? উত্তর এল, না। তাহলে কী? আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখাব, অর্থাৎ শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। কেন? কারণ, ওই বিদ্রোহকে আমরা এই সময়ের বাস্তবতার সাথে এক সুতোয় গাঁথতে চাই।''[১৬৬]

১৮৫৫-৫৭ সালের সাঁওতাল কিংবা হুল বিদ্রোহের অন্তরালে ছিল নির্মম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। জঙ্গলের অধিকারী আদি মানুষদের জঙ্গল কেড়ে নেওয়া, স্বাধীনতা তছনছ করা, শোষণে জর্জরিত করা ছিল এই সন্ত্রাসের মুখ। সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পিষে যাওয়া প্রান্তিক মানুষেরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। 'বাসি খবর' নাট্যসৃজনে এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে সত্তরের দশকের কৃষক বিদ্রোহ-নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয়। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী 'বাসি খবর' নাট্যসৃজনের গোড়া থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহ বর্ণনা করার কোন অভীপ্সা পোষণ করেনি। ভোমা বা 'মিছিল' নাটকের মতো 'বাসি খবর' নাটকেও এইসব প্রান্তিক মানুষদের বেদনার প্রেক্ষাপটে নিজেদের যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন। বুঝবার চেষ্টা করেছেন শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মনন কীভাবে ক্রিয়া করবে তার অভিমুখ ও রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিকে।

'বাসি খবর' নাটকটি শুরু হয়েছে এক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া দিয়ে। তারপর সেই শিশু ধীরে ধীরে বড়ো হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু ক্রমে আত্মস্থ করে প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃতি। অভ্যাসের স্বাভাবিক প্রবণতায় সে এগিয়ে যায় নিরাপদ মধ্যবিত্ত আচ্ছাদনের দিকে। এই আশ্রয়ের বোধ তাকে লালন করেছে— সুতরাং এটাই তার পছন্দ। ঠিক তখনই তার মধ্যবিত্ত নিশ্চিত জীবন থেকে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটে গেল। আগাগোড়া সাদা ব্যাণ্ডেজে মোড়া এক মৃতদেহ যৌবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। উঠে আসে অন্যপারের ইতিহাস। মরে যাওয়া, 'বাসি' হয়ে যাওয়া ইতিহাসের টুকরো তছনছ করে দিল তার নিরাপত্তার বোধ। ছক বাঁধা বৃত্তের বাইরে এবার সে পা রাখতে বাধ্য হল। কেঁপে উঠল ভূমি। শাসকের ক্ষমতা কাঠামো সমূলে উপড়ে ফেলার সংকল্পে সে চিৎকার করে বলেছে—

> ''মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটছে আর কী ঘটবে, সবাই জানে। এখনো চিৎকার করে উঠছি না কেন? সময় কি আসেনি? আসেনি?''[১৬৭]

খোকার এই জার্নি সেটা প্রকাশ করার জন্য বেশ কিছু ওয়ার্কশপ সরাসরি প্রয়োগ করা হয় নাট্যশৈলীতে। এই ওয়ার্কশপের অঙ্গ হিসেবে বেশ কিছু খেলা বা গেম 'বাসি খবর' নাটকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি অন্যতম হল স্পেস-কভারিং বা পরিসরকে চেনা। দলের প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে

একমুখী, নমনীয় ও সক্রিয় করে তোলার জন্য এই গেমের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই গেমটি ব্যবহার করে 'বাসি খবর' নাটকটি শুরু হয়েছিল। আঙ্গিকের বিশেষ প্রয়োগে গোড়া থেকেই 'বাসি খবর' নাটকটিতে একটা ছন্দবদ্ধ ঐকতান গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। চোখে চোখ রেখে চেষ্টা করা হয় দর্শকদের টেনে নিতে 'বাসি খবর'-এর নাট্যকাহিনিতে। 'বাসি খবর' নাটক মূলত তথ্য নির্ভর। অতীত, বর্তমান, মধ্যবিত্ত আশ্রয়, ছিন্নভিন্ন হওয়া সবই ঘটেছিল তথ্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ তথ্যের মধ্যেই সংবেদনশীল নাটকীয়তা মিশে ছিল। সমগ্র নাটকে যূথবদ্ধ অভিনয় করাই সম্ভব ছিল। কারণ কোনো একক চরিত্রের অন্যেকে ছাপিয়ে যাবার কোনো সুযোগ এই নাটকে ছিল না। নাটকের এই বিশেষ বিন্যাসের কারণেই ওয়ার্কশপ-কে সরাসরি প্রয়োগ করবার সুযোগ 'বাসি খবর' নাটকে ছিল।

স্পেস কভারিং বা পরিসরকে চেনা খেলার পাশাপাশি নাটকে তীব্র নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করবার জন্য দৌড়ের অনুশীলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। 'বাসি খবর' নাটকের বিন্যাসে এই খেলা যুক্ত করে বাদল সরকার দৌড়ের অন্তর্নিহিত শাক্তিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। দৌড়ের মধ্যে যুক্তিসংগতভাবে একটা বেড়া ভেঙে ফেলার উদ্যোগ থাকে, সেটাকে শতাব্দী আয়ত্ব করেছিলেন 'বাসি খবর' নাটকের সাঁওতাল হুলের বাঁধভাঙ্গা এনার্জি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করার জন্য। এই দৌড়ের মধ্যে সেদিন স্পন্দিত হয়েছিল ব্যথা, ক্রোধ এবং স্বপ্নের ধারণা। নাটকের বিন্যাসের সঙ্গে কীভাবে এই দৌড় যুক্ত করা হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে—

''এক।। ইংরেজ নীলকুঠি লুঠ!

...

এক।। জমিদারি ঘাঁটি লুঠ!

পাঁচ।। পাকুড় রাজবাড়ি!

ছয়।। মহেশপুর রাজবাড়ি!

.....

দুই।। (মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে) সৈন্য পালালো!

কোরাস।। (লাফিয়ে পড়ে) পালাল!

দুই।। পুলিশ জমাদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

দুই।। ডাকহরকরা চৌকিদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

...

দুই।। জমিদার পালালো!

কোরাস।। পালালো!

দুই।। ডিকু পালালো!

কোরাস।। পালালো! পালালো! পালালো!''[১৬৮]

এখানে দৌড়! দৌড়! আর দৌড়! সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসক তার দলবল নিয়ে সাঁওতাল হুলের তাণ্ডবের ধাক্কায় সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে পালাল। এটাই বিদ্রোহ। এটাই শক্তি। বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা চেয়েছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে একটা উদ্দাম দৌড়ের সাহায্যে চারপাশে ঘিরে থাকা দর্শকদের মধ্যে গেঁথে দিতে। এটাকেই শতাব্দী সেদিন সচেতন রাজনীতি বলে মনে করেছিল।

'বাসি খবর' নাট্যসৃজনে দৌড় অনুশীলনের পাশাপাশি ভাস্কর্য তৈরির খেলা (Sculpture) নামক এক বিশেষ খেলার অনুশীলন করা হত এতে ''একদল থিয়েটারকর্মী একটা বৃত্ত তৈরি করে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে বেরিয়ে আসে একটা গোলাকৃতি পরিসর। নির্দেশ পাওয়া মাত্র যে কোনো একজন বৃত্ত ভেঙে নিজস্ব ভঙ্গিমায় পড়ে থাকা ক্ষেত্রটিকে পরিক্রমা করতে থাকে। হেঁটে চলার ভঙ্গি ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। ... একটু সময় নিয়ে সে একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় খোলা জায়গাটায় স্থির হয়ে দাঁড়াবে। যেন সে একটা পাথরের মূর্তি। এরপর বাইরের বৃত্ত থেকে আরও একজন বেরিয়ে আসবে, সৃষ্টি করবে নিজস্ব বলয়, স্থির হয়ে দাঁড়াবে। সৃষ্টি হবে একটি ভাস্কর্য। এখানে একটাই নতুন শর্ত যুক্ত হবে। দ্বিতীয় ভাস্কর্য অবশ্যই প্রথম ভাস্কর্যকে কোনো না কোনো ভাবে স্পর্শ করে থাকবে। একইভাবে সমস্ত পারফরর্মার একযোগে সুষমামণ্ডিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে তৈরি করবে ভাস্কর্য যা তৈরি হবে ব্যক্তির নিজস্ব ছন্দে। একই সঙ্গে সমস্ত ভাস্কর্যটি হবে একটা দলবদ্ধ সৃষ্টি। একটা বিশেষ দিকে মুখ করে থাকবে এই যৌথ সৃষ্টি।''[১৬৯] ভাস্কর্য তৈরির মাধ্যমে শতাব্দী সেদিন অপমানিত মানবাত্মার ক্রোধ চারিদিকে বসে থাকা অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। ভাস্কর্য গড়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি পারফর্মার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ঘাড় মটকে খুন হওয়া আদিম মানুষের গায়ে। তারা শাসকের চোখে চোখ রেখে সম্মিলিতভাবে উচ্চারণ করে:

> ''... ইংরেজ শাসকের আসল কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা। ভূমিরাজস্ব দু'হাজার টাকা থেকে বেড়ে ষোলো বছরে তেতাল্লিশ হাজার টাকায় উঠেছিলো ১৮৫৪ সালে। অল্প খরচে কার্যকরী শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে সাঁওতাল অঞ্চলকে দেখানো হোতো।

...

কোরাস ।। (মৃদুস্বরে) দামিন-ই-কো-দামিন-ই-কো...

এক।। বছরের পর বছর সীমাহীন শোষণ-উৎপীড়ন-অত্যাচারের চাপে সাঁওতালদের মাদলের স্খলিত ধ্বনি কখন যে বিদ্রোহে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে—"[১৭০]

ওয়ার্কশপ পদ্ধতি অনুসরণ করে যূথবদ্ধ ভাস্কর্য 'বাসি খবর' নাটককে 'বাসি' হয়ে যাওয়া সাঁওতাল হুলের তথ্য পরিবেশন করা হয়। অভিনেতার সাঁওতাল চরিত্র সেজে বিদ্রোহের খবর উপস্থাপন করবার কৌশল অবলম্বন করে না। বরং মধ্যবিত্ত, নিস্পৃহ দর্শকদের দিকে তারা সোজা ছুঁড়ে দেয় সংবাদের তীক্ষ্ণ ফলা। অভিনেতাদের মতো দর্শকও বিদ্ধ হয়। এইভাবে সেদিন পরিবর্তনের দর্শন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল আপামর সাধারণ দর্শকের দরজায়।

একটা ভিন্নধারার থিয়েটার শৈলী গড়ে তুলতে হলে হাতে কলমে কাজ করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ প্রয়োগ বাদ দিয়ে শুধু নাট্যতত্ত্ব নির্মাণ দিয়ে চলে না। দর্শন থাকতে পারে, আদান-প্রদানের প্রসঙ্গ থাকতে পারে। কিছু উৎসাহী মানুষও থাকতে পারেন— তবু এই উপাদানগুলি যোগ করলেই শিল্প সৃজন হয় না। তৃতীয় ধারার থিয়েটার বহনীয়, নমনীয় ও সুলভ, কিন্তু তারও আগের পর্ব হল থিয়েটার শিল্পটা সৃজন করা। অর্থাৎ একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভাকে নানা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটা পরিণত স্তরে নিয়ে যাওয়া। 'বাসি খবর' নাটক শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীকে এই পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শতাব্দীর থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাসে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসৃজন হল 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে'। প্রথমটির সময়কাল ১৯৭৭ আর দ্বিতীয়টির সময়কাল ১৯৮১ সাল। এই দু'টি নাট্যসৃজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চার বছর হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে একই গোত্রের। দু'টি নাটকেই ভাষার ব্যবহার ছাড়া একটা বিশেষ মতাদর্শ প্রকাশ করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। ইন্টারন্যাল ওয়ার্কশপের উপর ভিত্তি করে নাটক সৃজন করা হয়েছিল। ওয়ার্কশপের ধারাবাহিক চর্চার ভিত্তিতে স্বরক্ষেপন, শারীর বিন্যাস, ধ্বনির ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল যা 'ভোমা' ও 'বাসি খবর' নাট্যনির্মাণেও করা হয়েছিল। তবু এই নাটক দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এই নাটক দুটি ছিল ভাষাহীন। 'ভোমা' নাট্যসৃষ্টিতে ক্ষুধা নিয়ে ইন্টারনাল ওয়ার্কশপের পাশাপাশি 'ভোমার ক্ষুধা লাগে' এই ভাষা ছিটকে বেরিয়ে এসে 'ক্ষুধা' শব্দের অনুভবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই নাটক দুটিতে ভাষা ছাড়া ক্ষুধা বা ভালোবাসার বন্ধন প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' নাট্যসৃজন সম্পর্কে বাদল সরকার বলেছেন:

> ''ভাঙা মানুষ' বলতে ভেঙে পড়া অথবা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এক মানুষ। সেটা ১৯৭৭-এর প্রথম দিক। আমরা দড়ি, খুচরো পয়সা, বাসি রুটি-এইসব দিয়ে অনাহার, টাকাপয়সা, বন্দিত্ব, অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কর্মশালা করছিলাম। সেই কর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র এনার্জি আমাদের একটা 'র-ওয়ার্কশপ' করতে প্রলুব্ধ করল। এটা একটা অস্বাভাবিক ধারণা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সঙ্গত ও প্রচণ্ড আপত্তি উঠল। কিন্তু দীর্ঘ বিতর্ক ও আরও কর্মশালার পরে আমরা এগোনোর ঝুঁকি নিলাম। যোগদানকারীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে এটাকে আমাদের সবচেয়ে বড় চলা বলা যেতে পারে। এত তীব্র অনুভূতি নিয়ে আমরা অভিনয় করতাম যে একটা সামান্য বিষণ্ণ হাসিও আমাদের ভীষণভাবে ধাক্কা দিত। আর সেই কারণেই মাত্র ন'টা অভিনয়ের পর এটা নিয়ে আমরা আর চলতে পারিনি। ... বছর চারেক পরে আমরা 'মানুষে মানুষে' নামে ওই বিষয়ের ওপরেই নির্দিষ্ট একটা নাটকের চেহারা দিলাম। ... 'মানুষে মানুষে' আমাদের রেপার্টরির একটা প্রায় সংলাপহীন প্রযোজনা...।"[১৭১]

'ভাঙা মানুষ' বা 'মানুষে মানুষে' নাটক দুটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যায্য পীড়ন বাদল সরকারসহ সমগ্র শতাব্দী নাট্যদলকে বিচলিত করেছিল বলেই সংলাপহীন নাটক দুটি সেদিন সৃজন করা হয়েছিল। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মর্মে ছিল সমবেতভাবে দর্শকদের সঙ্গে নিয়ে সতেজ বিদ্রোহের স্বর উচ্চারণ করবার ইচ্ছা। একটা বিশেষ দর্শন ও তার জন্য এই নাটক দুটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। যে পদ্ধতি ব্যবহার করে এই নাট্যনির্মাণ সম্ভব হয়েছিল তার প্রতি স্বরে মিশে ছিল রাজনৈতিক দ্যোতনা। এই দুটি নাটকে কতগুলি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়। আসলে নাটকে কতগুলি পরস্পর বিরোধী ঘটনা, অবস্থান, ক্রিয়া, নৈঃশব্দ, হুংকার একযোগে একটা বেগ তৈরি করে। এক বিশেষ অভিমুখে এই বেগ ধাবিত হয়। এই গতির বিপরীতে স্থাপন করা হয় অন্য কোন ঘটনা বা অবস্থান— তৈরি হয় সংঘাত। গড়ে ওঠে নাটকীয় মুহূর্ত। 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' দুটি সংলাপহীন নাটকে কিছু শব্দ, কিছু ধ্বনি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে নানা নাট্যমুহূর্ত। শুকনো রুটি, চাবুক, ঘণ্টা, পয়সার থালি, কালো কাপড়, ঝকমকে নাগরা জুতো, বেলুন প্রভৃতি নানা প্রপ ব্যবহার করে নানা দলবদ্ধ ও একক দেহভঙ্গিমা দিয়ে এই মুহূর্তগুলি তৈরি করা হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নাটকীয় সংঘাত। একদিকে চাবুক, অন্যদিকে বাসি রুটি— নাটকের গতিমুখ নিয়ে এসেছে স্তরবিভক্ত সমাজের অন্যায্য রাজনীতি। খণ্ড খণ্ড

নাট্যমুহূর্তগুলি জোড়া দিয়ে তৈরি হয় এক নাট্যপ্রবাহ। ভাষা ছাড়া খিদে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সমাজের অসম কাঠামোকে তুলে ধরার জন্য শতাব্দী নাট্যদল সেদিন 'ভাঙা মানুষ', 'মানুষে মানুষে' নিয়ে হাজির হয়েছেন মানুষের দরবারে।

'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' নাটক দুটির দর্শক প্রতিক্রিয়া সেদিন কিন্তু অনুকূল ছিল না। দর্শকের ঔদাসীন্য শতাব্দীকে বাধ্য করেছিল এ দুটি নাটকের অভিনয় বন্ধ রাখতে। বাদল সরকার 'ভাঙা মানুষ' সম্পর্কে বলেছেন— 'মাত্র ন'টা অভিনয়ের পর এটা নিয়ে আমরা আর চলতে পারিনি।'[১৭২] একথা 'মানুষে মানুষে' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রশ্ন হল তবে কেন এই নাট্যসৃজন? ভাষাহীন এই দুটি নাট্যনির্মাণ আদৌ দর্শকদের মনে পৌঁছোবে কি না সেই ঝুঁকি তো ছিলই। তাহলে শতাব্দী কেন নিজেদের টেনে নামালো এই ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায়? সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর দলের সহকর্মীরা বুঝতে চেয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যকর্মের শর্তাবলী কী? দর্শক প্রতিক্রিয়া যেমন একটা দিক, প্রথাসিদ্ধ পণ্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর টিকে থাকাটাও একটা দিক। বাদল সরকার ও তাঁর দলের কর্মীরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন পণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে নতুন চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী থিয়েটারকর্মীর প্রয়োজন। মূলধারায় টিকে থাকাটা কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। কিন্তু ধরাবাঁধা শর্তে বিকল্প থিয়েটার বেশিদিন চলবে না, প্রসারিতও হবে না। বহু ব্যবহারে শব্দের অর্থ বা দর্শন হারিয়ে যায়, সুতরাং জীবন্ত দর্শন সৃষ্টি করবার জন্য ভিন্ন শর্ত, ভিন্ন রাজনীতি প্রয়োজন হয়। তাই তীব্র সংবেদনকে জড়ো করে, নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে দর্শকের অঙ্গনে নিজেদের নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কোন যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাত্রা করা হয়নি। সক্রিয় দর্শন ছিল এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের প্রতিটি নাটকেই সমাজসম্পৃক্ত প্রশ্ন নিয়ে আসা হয়েছে, এসেছে তর্ক ও যুক্তি। তর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে দর্শক-নাট্যকর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক। সেদিন শতাব্দীর অভিনয়ে কোন মুখোশ ছিল না, ছিল না কোন পক্ষ। প্রতিটি ভঙ্গিমা, চেয়ে থাকা, ছন্দ, কোরিওগ্রাফি, সমস্তই প্রকাশ করা হত একটা বিশেষ মানসিক স্তর থেকে। চেতনা ও সৎ আবেগ এক ভিন্ন স্তরে উন্নীত করবার দুর্লভ প্রয়াস ছিল 'ভাঙা মানুষ', 'মানুষে মানুষে' নাটক দুটিতে। দর্শক প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হলেও বেড়া ভাঙবার এই সিদ্ধান্ত শতাব্দীকে সেদিন নিতে হয়েছিল।

শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর চিন্তা কাঠামোয় একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট খুঁজবার ও তাকে নাটকে যুক্ত করবার প্রক্রিয়া খুব সক্রিয় ছিল। রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে মতাদর্শের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার অন্তর্নিহিত যুক্তি বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনে যুক্ত নবীনদের স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গেলেও ইতিহাসে স্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই ইতিহাস চেতনাই সেদিন

প্রেরণা জুগিয়েছিল নবীন সন্ধানের যাত্রাপথকে। সত্তরের দশকের সেই অন্যায্য রাষ্ট্রকাঠামোয় দাঁড়িয়ে খিদে কী সেটা শতাব্দীর থিয়েটার কর্মীদের অনুভব করবার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই এই নাট্যসৃজন করা হয়েছিল। এই দুটি নাটক সফল না হলেও এর মধ্যে প্রোথিত ছিল থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের রাজনৈতিক নির্যাস। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন সত্য চেতনার উচ্চারণের জন্য তৈরি হয়েছে কি না তা বিচার করবার দরকার ছিল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের থিয়েটার বেচবার কোন দায় ছিল না। বাদল সরকার ও তাঁর শতাব্দীর 'কোম্পানি' খুলে থিয়েটার বেচবার কোন অভীপ্সা ছিল না। ফলে লাভ-লোকসানের হিসেব না করে এইরকম একটি ঝুঁকিপূর্ণ নাট্যসৃজন করতে কোন দ্বিধা ছিল না। খিদে, অসাম্য, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, উচ্চাশা পার হয়ে কী করে মানুষে মানুষে ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলা যায় এই ভাবনা থেকেই 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' নাট্যসৃজন। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন সেদিন নিত্য নতুন সম্ভাবনায় যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সেটা পরখ করে দেখবার প্রয়োজন হয়। 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' নাট্যসৃজনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন বিশাখা রায়। এই দুটি নাট্যসৃজনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন:

> ''*ভাঙা মানুষ, মানুষে মানুষে* শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর সীমা অতিক্রম করবার কাহিনি। *মানুষে মানুষে* ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করবার এক জীবন্ত উদ্যোগ। ভাঙা ভাঙা মানুষ, টুকরো টুকরো মানুষ অসাম্যের বেড়া টপকে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়বে এই স্বপ্নকথা এই দুটি ভাষাহীন নাটকে উচ্চারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেটাই ছিল আমাদের অভিপ্রায়।''[১৭৩]

বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদলের কর্মীরা সেদিন উপলব্ধি করেছেন ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সমগ্র কাঠামোটিই অন্যায্য বিভাজন দ্বারা পীড়িত তাই নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ না নিয়েও স্তরবিভক্ত অসম বিভাজনের বিপক্ষে একটা রাজনৈতিক অবস্থান নিতে হয়েছিল বাদল সরকার ও তাঁর দল 'শতাব্দী'কে। 'ভাঙা মানুষ' ও 'মানুষে মানুষে' ছিল শতাব্দীর অন্নহীন ভারতবাসীর সংগ্রামে সামিল হবার জোরালো হাতিয়ার। উন্মুক্ত হয় থিয়েটার সৃষ্টির নতুন দুয়ার। জোর দেওয়া হয়েছিল মানবমনের গূঢ় শিল্পসম্ভারকে। শরীরী নানা ছন্দ, দেহভঙ্গিমায় ক্ষুধার তীব্র অনুভবকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পুরোপুরি হয়ত সফল হননি, কিন্তু চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। শুকনো রুটি চিবিয়ে খেতে খেতে একটা অনুভব শতাব্দীর প্রতিটি সদস্যকে সেদিন ঘিরে ধরেছিল। খুলে গিয়েছিল থিয়েটার সৃষ্টির নতুন দরজা। কিছু সময়ের জন্য হলেও 'ক্ষুধা' শতাব্দীর প্রত্যেকের সংবেদনে আছড়ে পড়েছিল। একেই তো বাদল সরকার ও তাঁর দল সৎ চেতনা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এই সৎ চেতনাই সেদিন বাদল সরকার ও তাঁর নাট্যদল

শতাব্দীকে শব্দহীন এই দুটি নাটক নির্মাণে প্ররোচিত করেছিল, প্রেরণা জুগিয়েছিল। একই সঙ্গে থার্ড থিয়েটার আন্দোলনে সংযোজিত হয়েছিল নতুন মাত্রা।

বাদল সরকার কোথাও এক জায়গায় বেশিদিন থেমে থাকেননি। খোঁজ, খুঁজে চলা। চলতে চলতে নতুন সম্ভাবনা। নতুন এক দিশা। এক পরিণতি থেকে অন্য পরিণতিতে। এক লক্ষে অন্য পথে। ভিত্তিভূমি যার এক বলিষ্ঠ দর্শন। ১৯৮৬ সালের ২৮, ২৯, ৩০ মার্চ, বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল শতাব্দী এবং আরো বেশ কিছু গান ও নাটকের দল মিলে শুরু করেন গ্রাম পরিক্রমা। গ্রাম থেকে গ্রামে এগিয়ে চলল শতাব্দীর সম্মিলিত গ্রাম পরিক্রমা— উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুর, চারঘাট, মোল্লাডাঙা, দরগা, চারঘাট যোগেশ পাঠাগার, বলরামপুর, দক্ষিণ চাকদহ, সুটিয়া, রামচন্দ্রপুর এবং শেষে ঠাকুরনগর। এর আগে বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল নিয়ে এক আধবার যে গ্রামে যায়নি তা নয়। কিন্তু সেগুলি ছিল মূলতঃ আমন্ত্রমূলক। অনুষ্ঠান হওয়া থেকে সব কিছুই নির্ধারিত হয় উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে। এবারের গ্রাম পরিক্রমার ভঙ্গিটাই ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমত, এটা সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগ, দর্শকরা থিয়েটার করবার জন্য তাঁদের ডেকে নিয়ে যাননি, তাঁরাই গেছেন দর্শকের কাছে তাঁদের থিয়েটার নিয়ে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি দল নয়, ছ'টি নাট্যদল (শতাব্দী, পথসেনা, এরিনা থিয়েটার গ্রুপ, তীরন্দাজ, ঠাকুরনগর সাংস্কৃতিক পরিষদ ও ঋত্ম) এবং দু'টি গানের দল (পি এটি অশোনগর এবং হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা) একত্রে অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, অনুষ্ঠান ও একদিনের বা নির্দিষ্ট কোন একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই পরিক্রমা হয় তিন দিন ধরে ২৮ মার্চ থেকে-৩০ মার্চ পর্যন্ত। চতুর্থত, এর আর্থিক দায় (যাতায়াত ও খাওয়া খরচ) বহন করেন গ্রামের মানুষরা, অংশগ্রহণকারী দলগুলি এবং কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি। সুতরাং এই গ্রাম-পরিক্রমা সম্পূর্ণ আলাদা। এখন প্রশ্ন হল কেন এই গ্রাম পরিক্রমা? ১৯৮৬-তে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর বহু নতুন ধারার নাট্যসৃজন করা হয়ে গিয়েছিল। তাহলে বারবার নিজেদের পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন কী? এ প্রসঙ্গে শুরুতেই বলতে হয় বেঙ্গালুরুর 'সমুদায়া' নামক একটি নাট্যগোষ্ঠীর কথা। যারা নিয়মিত গ্রামে গ্রামে গিয়ে নাটক করে। কোথাও যেন এইরকম একটা কিছু খুঁজছিলেন শতাব্দীর কর্মীরা। এই রকম একটা সমাজ পরিবর্তনের সংস্কৃতি-এক অন্য ভোরের স্বপ্নের সন্ধান করছিলেন বাদল সরকার ও তাঁর দল শতাব্দী। এতদিন নাটক করছিলেন শ্রমজীবীদের নিয়ে, অথচ তারাই অনুপস্থিত। তাদের কাছে পৌঁছতে হবে। প্রয়োজনে আরও বড় উঠোনের খোঁজ। ভারতবর্ষ-সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উঠোন গ্রাম। নাটক, গান নিয়ে শতাব্দী ও সহযোগী নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা চললেন সেই গ্রামে। শুরু হল গ্রাম পরিক্রমা। কেন পরিক্রমা, সঙ্গতভাবেই বাদল সরকার বলেছেন—

> ''মানুষ দর্শক হয়ে বিশেষ স্থানে আসবে, এ অপেক্ষায় না থেকে, যেখানে মানুষ থাকে, কাজ করে, সেইখানে নিজেরাই পৌঁছে থিয়েটার করে তাকে দর্শকে পরিণত করা যাচ্ছে। অনেক ব্যাপক হচ্ছে থিয়েটারের ক্ষেত্র, বিষয়বস্তু পৌঁছে দেবার ক্ষেত্র।''[১৭৪]

এই উদ্দেশ্যেই থিয়েটারের এক পৃথক ভাষার সন্ধানে শুরু হয় গ্রাম পরিক্রমা। আসলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমস্ত কাঠামো এবং বিচ্ছিন্ন প্রান্তিক মানুষের কাছে যাবার এবং তাদের বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছিল এই গ্রাম-পরিক্রমায়। বাদল সরকার বলেছেন— ''কারণ আমরা জানি যে গ্রামে না গেলে দেশের সত্যিকারের পরিস্থিতিটা বোঝা যায় না।''[১৭৫] ভারতবর্ষের অধিকাংশ দরিদ্র, গ্রামীণ ও বঞ্চিত মানুষের কাছে এক সরল ও তীব্র থিয়েটারকে পৌঁছে দিতেই বাদল সরকারের, শতাব্দী ও তাঁদের সহযোগী কিছু নাট্যগোষ্ঠী সেদিন গ্রাম-পরিক্রমায় সামিল হয়েছিল। যে থিয়েটার তাদের জীবনের বঞ্চনা এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করবে। সেই সঙ্গে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংঘবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা কোনো বৈপ্লবিক চেতনা চাপিয়ে দেওয়া কিন্তু গ্রাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রাম শহরের অসম বিভাজনকে দূর করবার লক্ষ্য নিয়েই সেদিন বাদল সরকারের শতাব্দীসহ ও অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠী গ্রাম পরিক্রমায় সামিল হয়েছিল। সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে তাই দীপঙ্কর দত্ত লিখেছেন—

> ''শহরকে বাঁচাতে হয় গ্রামকে ঠকিয়ে। অথচ এরকম হবার কথা ছিল না। সহজেই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারত। হয়নি। ফিরে এসেছি আবার সেই শহরে। পাঁচিল টপকে গিয়েছিলাম, পাঁচিল ভাঙতে পারিনি। হয়তো আমরা পারবোও না। তবুও যন্ত্রের দাসত্ব করার আগে হয়তো বারবার এভাবে পাঁচিল টপকে পালাতে হবে সেই সব মানুষের কাছে। অনেক আঘাতে পোড় খাওয়া শক্ত বুক, ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে যাঁরা একমাত্র পারেন মানুষের সাথে মানুষের বিভেদের পাঁচিলটাকে গুঁড়িয়ে দিতে।''[১৭৬]

কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ কাঠামোকে তাঁরা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর এই কারণে থিয়েটারের বাঁধাধরা পথ থেকে সরে এসে নাটক গান নিয়ে শুরু করেছিলেন এক সাংস্কৃতিক পদযাত্রা তথা গ্রামপরিক্রমা। প্রচলিত বেচা-কেনার পদ্ধতির বাইরে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে মানুষের যোগসূত্র আর বন্ধনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন গ্রাম পরিক্রমায়। রাতের অন্ধকারে, ধান ওঠা খরখরে আলপথ মাড়িয়ে,

গান গাইতে গাইতে বাদল সরকারসহ শতাব্দী ও অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা হাজির হয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব মানুষদের বৃহৎ উঠোনে— গ্রামে। সাধারণত, একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে থাকা, নাওয়া, খাওয়া, নাটক, গান আলোচনা। দিনের পর দিন প্রায় প্রায় নিয়ম করে বাদল সরকার তাঁর নাট্যদল শতাব্দী এবং সহযোগী নাট্যগোষ্ঠীদের নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা চালিয়ে গেছেন। গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার যথার্থ অর্থেই হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের। অভিনেতা দর্শকের অবাধ মিলন সম্ভব হয়েছে গ্রাম পরিক্রমায় সমস্ত বাধা ভেঙে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছে মুক্ত থিয়েটার। শতাব্দী নাট্যদলের অন্যতম একজন কর্মী গৌতম সেনগুপ্ত গ্রাম পরিক্রমার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাই লিখেছেন—

> ''প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় সকলেই আমরা দর্শকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। দর্শকরাও এগিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে। উভয়ের মেলামেশা ঘটেছে অবাধ। ... কোনো ফাঁক বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।''[১৭৭]

বাদল সরকার এতদিন এই থিয়েটারেরই তো সন্ধান করেছেন! ১৯৭১ সালে 'গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ সমন্বয়ের থিয়েটার' (Workshop for a theatre of synthesis as a rural-urban Link) বলে যে থিয়েটারের সন্ধানের সূত্রপাত, পনেরো বছরে (মার্চ, ১৯৮৬) এই সন্ধানের একটা পরিণতি ঘটেছে এই গ্রাম পরিক্রমায়। যথার্থ অর্থেই গ্রাম শহরের, থিয়েটারের সমন্বয় ঘটে এই পরিক্রমার মধ্যদিয়ে। থার্ড থিয়েটার আন্দোলনও গ্রাম পরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটা পরিণতির স্তরে পৌঁছায়। এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

> ''সত্তরের দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত অন্তত তিনটে দশক জুড়ে বাদলবাবুর পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে যে থিয়েটার আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার— তার নামকরণে 'থার্ড থিয়েটার' থেকে 'ফ্রি থিয়েটার'-এই আমার বেশি আনুগত্য-তার একটা স্বাভাবিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পর্বান্তর ঘটে পরিক্রমায়।''[১৭৮]

এই স্তরে পৌঁছেই যেন বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার একটা পূর্ণরূপ পায়। ৭১ সালে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল— যে কারণে, তারই প্রায় পূর্ণরূপ এই গ্রাম-পরিক্রমা। ধীরে ধীরে যত খোঁজ তত পরিণত হয় চিন্তাভাবনা। পরিশীলিত হয় তাঁর নাট্যভাবনা। এক্ষেত্রে অবশ্যই সমষ্টির দান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের একদল তরুণ-তাজা প্রাণের বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারকে যে ভিন্নমাত্রা সঞ্চার করে তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। শুধু যে তাঁর থার্ড থিয়েটারের পর্বান্তর ঘটে তা-ই নয়, স্বয়ং বাদল সরকারেরও মধ্যে একটা আমূল রূপান্তর ঘটে। বেশ কিছু আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর জীবন্ত উপস্থিতি এবং রাজনীতির ইতিহাস তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। বাদল সরকার একটা সময় বামরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা বা অন্য কোন গণ-আন্দোলনের ধারে কাছেও ছিলেন না। সেই বাদল সরকার মাথায় একটা গামছা বেঁধে চড়া রোদে পায়ে হেঁটে একটার পর একটা গ্রাম পরিক্রমা করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাদল সরকার নিয়মিত গ্রাম পরিক্রমা চালিয়ে গেছেন। সঙ্গে পেয়েছেন একদল তাজা যৌবন। রূপান্তর না ঘটলে এমনটা হয় না। সম্মিলিত প্রয়াসেই সেদিন নির্মিত হয় থিয়েটারের এক পৃথক ভাষা। জাঁকজমক বাহুল্যবর্জিত মাঠের নাটক, খুঁজে পেল এক নতুন প্রাণ। থার্ড থিয়েটার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বাংলা সহ পড়শি রাজ্যেও বিশেষ করে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, মিজোরাম, মণিপুরে শতাব্দীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু নাট্যদল এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। সেদিনের সমগ্র চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক দর্শনবোধ একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়েই থার্ড থিয়েটার আন্দোলন দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছিল। আর এই কারণেই সমকালে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে নিয়েছে। থার্ড থিয়েটারের একনিষ্ঠ দর্শক ও তাত্ত্বিক সহযোগী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাই বলেছেন—

> ‘‘পশ্চিম বাংলার নাট্য আন্দোলনের ক্রমান্বয়িক ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলনের পর তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনেই বোধ হয় প্রথম আবার একটা সমাজসচেতন ভাবাদর্শের ভিত্তিমুখ পাওয়া গেল। মধ্যে যে কটি ধারার উত্থান ঘটেছে, তাদের প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য সীমিত ছিল থিয়েটারের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা তথা শক্তির উন্মোচনে, এক বিশেষ নাগরিক মধ্যবিত্ত দর্শক সমাজের রুচি ও চাহিদার সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলকে মেনে নিয়েই তার যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিত হয়েছে।’’[১৭৯]

আমরা এখানেই নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যভাবনা তথা তাঁর তৃতীয় থিয়েটার বিষয়টির আলোচনা শেষ করছি। প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে যে থার্ড থিয়েটার নামক বিকল্প থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন তার স্বরূপ, তার প্রয়োগ কৌশল এবং কীভাবে একটা সময়ে তা সর্বভারতীয় নাট্যআন্দোলনে পরিণত হয় সেই দিকগুলিই এই অধ্যায়ে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সূত্র নির্দেশ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৩। বাদল সরকার তাঁর 'The Third Theatre' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল সরকারের মন্তব্যটি বাংলায় ভাষান্তর করে তার উক্ত গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। সেটিই এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৪৩

৩. সরকার, বাদল : প্রবাসের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-৭৮, পৃ. ২২৭-২২৮

৪. Sircar, Badal : Voyages in the Theatre, Shri Ram Memorial Lecture iv 1992, P.54

৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P.25

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৪

৭. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪

৮. বাদল সরকার, দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১০১

৯. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৪৭

১০. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড,

কল-২৫, পৃ. ১৭

১১. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪

১২. বাদল সরকারের সঙ্গে সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার: যুগান্তর, রবিবার, ১২ ই মার্চ, ১৯৯৫, পৃ. ৭

১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৫

১৪. মণ্ডল, বিভাসকান্তি : থার্ড থিয়েটার এবং বাদল সরকার, আগন্তুক, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ৩৪০ ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (দোতলা), ঢাকা-১০০০, পৃ. ৩৫-৩৬

১৫. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১১৬। বাদল সরকার স্মারক সংখ্যায় দেবাশিস চক্রবর্তী 'প্রসঙ্গ বাদল সরকার' প্রবন্ধে বাদল সরকারের মন্তব্য ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৬. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ১৩৮, উক্ত বই দর্শন চৌধুরী বাদল সরকারের মন্তব্য ব্যবহার করেছে, এখানে সেটিই তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৭. তদেব : পৃ. ১৩৭-১৩৮

১৮. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১১৯

১৯. তদেব : পৃ. ১১৮

২০. সরকার, বাদল : 'ইস্তাহার', নানামুখ, প্রকাশক অঞ্জলি বসু, প্রথম প্রকাশ,

১৯৮৮, পৃ.২৭৮

২১. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২৩

২২. ঘোষ, ড. অরুপরতন : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেন'স কম্পাউন্ট, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ১১

২৩. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৬৯

২৪. তদেব : পৃ. ৭০

২৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P. 3

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ২০৩

২৭. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৯, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৯৮-৯৯

২৮. 'থার্ড থিয়েটার : কাউন্টার কালচার' নাম দিয়ে কর্ণিক পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৫-এ বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। পরে অমৃতলোক, বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৯৬-তে তা পুনর্মুদ্রিত হয়। বর্তমান উদ্ধৃতি অমৃতলোক থেকে দেয়া, পৃ. ৯২

২৯. সেখ জাহির আব্বাস : 'মুক্ত নাটক বিষয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যসৃজনী, শারদসংখ্যা, ২০১১, পৃ. ২৮৫

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৮৯

৩১. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নাট্যচিন্তা

ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৭১

৩২. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২০

৩৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮১

৩৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ.১৮

৩৫. তদেব : পৃ. ১৮

৩৬. বাদল সরকার, দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১০৪

৩৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ ঘোষের সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১

৩৮. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটার বেচাকেনা' প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৪৩

৩৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯, প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ১৯

৪০. চৌধুরী, উত্তম : ১৬টি সাক্ষাৎকার, 'বাদল সরকারের সঙ্গে কাজল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার', বাণী শিল্প, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, কল-০০৯, পৃ. ১২১

৪১. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯' প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২০

৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৩৫

৪৩. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকার নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারের মুখোশ' প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৬৫

৪৪. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৩৫

৪৫. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৫৯

৪৬. সরকার, বাদল : 'রাতজাগা', নানামুখ, লেখনী, পৃ. ২৬৯

৪৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ ঘোষের সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১

৪৮. সেখ জাহির আব্বাস : 'মুক্ত নাটক বিষয়ে বাদল সরকারের সাক্ষাৎকার, নাট্যসৃজনী, শারদসংখ্যা, ২০১১, পৃ. ২৮৫

৪৯. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ২৮

৫০. তদেব : পৃ. ২৩

৫১. ঘোষ, ঋতদ্বীপ (সম্পাদিত) : বাদল সরকারের 'থিয়েটারি থিয়েটার: অঙ্গনমঞ্চ' প্রবন্ধ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০ বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ.৪৯

৫২. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৮৮-৮৯

৫৩. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫২

৫৪. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৯৭

৫৫. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫৩

৫৬. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩১৬

৫৭. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪

৫৮. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৯৬-৯৭

৫৯. তদেব : পৃ. ৯৮

৬০. তদেব : পৃ. ১০০

৬১. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৫

৬২. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৯৩

৬৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'গণ্ডী' নাটকের মুখবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৪০৮

৬৪. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪,

পৃ. ৪৩

৬৫. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ দির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৬১

৬৬. তদেব : পৃ. ২৬১

৬৭. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩২

৬৮. তদেব : পৃ. ৩২-৩৩

৬৯. বাদল সরকার, দেবাশিস মজুমদারের সাক্ষাৎকার : বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কল-০০১, পৃ. ১১৫

৭০. তদেব : পৃ. ১১৭

৭১. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।

৭২. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৪৫

৭৩. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।

৭৪. তদেব : পৃ. ৬৯

৭৫. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ১০৬

৭৬. তদেব : পৃ. ১০৬

৭৭. Jerzy Grotowski : Towards a Poor Theatre, (Edited by Eugenio Barba) Routledge A Theatre Arts Book, New York, First Routledge edition, 2002, P. 15

৭৮. তদেব : পৃ. ১৯-২০

৭৯. তদেব : পৃ. ১৬

৮০. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারে মুখোশ' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৬১

৮১. Jerzy Grotowski : Towards a Poor Theatre, (Edited by Eugenio Barba) Routledge A Theatre Arts Book, New York, First Routledge edition, 2002, P. 19

৮২. তদেব : পৃ. ৫৭

৮৩. Sircar, Badal : Voyages in the Theatre, Shri Ram Memorial Lecture IV, 1992, P.54

৮৪. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P.25

৮৫. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৫

৮৬. তদেব : পৃ. ১০৫

৮৭. সরকার, বাদল : ইশতেহার, মার্চ, ১৯৭৭, নানামুখ, অঞ্জলি বসু, ১৯৮৮, পৃ. ২৭৮

৮৮. রিচার্ড শেখনারের সঙ্গে ড. অরুপরতন ঘোষের সাক্ষাৎকার : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেন কম্পাউন্ড, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ১৭

৮৯. তদেব : পৃ. ১৯

৯০. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩২

৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, পৃ. ১৫-১৬

৯২. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৯

৯৩. তদেব : পৃ. ২৫৯-২৬০

৯৪. তদেব : পৃ. ২৬০

৯৫. Sircar, Badal : The Third Theatre, First Published by Badal Sircar on August 1978, P. 40

৯৬. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৬০

৯৭. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১০৬

৯৮. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ দির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৯

৯৯. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৯৫

১০০. তদেব : পৃ. ১০৯

১০১. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৬০।

১০২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাঙলার গ্রামীণ লোকনাটক (সনৎ মিত্র সম্পাদিত), উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য, পৃ. ১

১০৩. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রবন্ধ 'বাদল ধারায়', প্রবীর গুহ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১০৮

১০৪. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কল-০৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৭

১০৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ,

চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮০

১০৬. চৌধুরী, দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কল-০৯, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৯

১০৭. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, প্রবন্ধ 'বাংলা থিয়েটার বাংলা নাটক', অভিষেক বসু, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ১৬৬

১০৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ, রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-১৭, পৃ. ৬৮১

১০৯. তদেব : পৃ. ৬৮০

১১০. তদেব : পৃ. ৬৮০

১১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'তপতী' নাটক, ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ১০৩৩-৩৪

১১২. তদেব : পৃ. ১০৩৪

১১৩. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ ঘোষের সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪০

১১৪. বাদল সরকারের সঙ্গে বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার : নাট্যপত্র স্যাস্, সংকলন ১৬, ৬৮ ফির্যাস লেন, কল-৭৩, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৬

১১৫. সরকার, বাদল : প্রবাহের হিজিবিজি, লেখনী, ডিসেম্বর, ২০০৬, ৯০০ পূর্বাঞ্চল মেন রোড, কল-১২, পৃ. ২৮

১১৬. তদেব : পৃ. ২২৮

১১৭. বাদল সরকারের সঙ্গে দীপঙ্কর দত্তের সাক্ষাৎকার : অঙ্গন, অন্য রীতির নাট্যপত্র, অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৬

১১৮. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩৩

১১৯. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'অঙ্গনমঞ্চে অভিনয়' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪২।

১২০. ভাদুড়ি, সত্য : বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, প্রবন্ধ 'বাদল সরকার: একাত্তরের এক স্মৃতি' অমিয় দেব, ১৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০, পৃ. ৩৪

১২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার, সীমা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, পৃ. ২০১-২০২

১২২. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৪৬-২৪৭

১২৩. চৌধুরী, দর্শন : নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার, একুশশতক, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১০, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৯১

১২৪. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৫২

১২৫. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৪২

১২৬. তদেব : পৃ. ৪৩

১২৭. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'তৃতীয় থিয়েটার বাঙালি দর্শক' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন,

কল-১৪, পৃ. ৬৯

১২৮. অমৃতলোক : বাদল সরকার বিশেষ সংখ্যা, 'থার্ড থিয়েটার কাউন্টার কালচার', জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ৯৩

১২৯. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'তৃতীয় থিয়েটার বাঙালি দর্শক' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৭১

১৩০. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২২

১৩১. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৩

১৩২. সরকার, বাদল : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, 'থিয়েটারি থিয়েটার : অঙ্গনমঞ্চ' প্রবন্ধ, ঋতদীপ ঘোষ, সম্পাদিত, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪, ১০বি ক্রিক লেন, কল-১৪, পৃ. ৪৮-৪৯

১৩৩. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ ঘোষের সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১

১৩৪. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৫০

১৩৫. তদেব : পৃ. ৮৭

১৩৬. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৬২

১৩৭. বাদল সরকারের সঙ্গে সুরজিৎ ঘোষের সাক্ষাৎকার : দেশ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২, বর্ষ ৬০, সংখ্যা ৩, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কল-০১, পৃ. ৪১

১৩৮. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ' থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ.২৬-২৭। এই গ্রন্থে একাত্তরের বীভৎস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের তথ্য তুলে ধরতে কল্যাণী ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ থেকে তথ্য তুলে ধরেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে।

১৩৯. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'মিছিল' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২০৯

১৪০. তদেব : পৃ. ২১১

১৪১. তদেব : পৃ. ২১১

১৪২. তদেব : পৃ. ২১০

১৪৩. তদেব : পৃ. ২৩২

১৪৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ : মিছিলে বাদল সরকার, একটি গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা, প্রথম সংস্করণ: বইমেলা ২০১৫, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কল-২৫, পৃ. ৩৫-৩৬

১৪৫. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ১০

১৪৬. তদেব : পৃ. ২১

১৪৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'মিছিল' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৩২

১৪৮. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৩২-৩৩

১৪৯. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ২৩

১৫০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ

পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ২৯৫

১৫১. তদেব : পৃ. ২৯৪

১৫২. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৪৬-৪৭

১৫৩. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩২৯

১৫৪. তদেব : পৃ. ৩০১-৩০২

১৫৫. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৫৩

১৫৬. তদেব : পৃ. ৫৪

১৫৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩২৮-৩২৯

১৫৮. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৬৭

১৫৯. তদেব : পৃ. ৪০

১৬০. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৬২

১৬১. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'ভোমা' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৩৩১-৩৩২

১৬২. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৪৮

১৬৩. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৭৯

১৬৪. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৮০

১৬৫. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৭৫-৭৬

১৬৬. তদেব : পৃ. ৭৭

১৬৭. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'বাসি খবর' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৫১০

১৬৮. তদেব : পৃ. ৪৯৮-৪৯৯

১৬৯. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ৯৫

১৭০. সরকার, বাদল : নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, 'বাসি খবর' নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল-৭৩, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭

১৭১. সরকার, বাদল : ভয়েজেস ইন দ্য থিয়েটার, অনুবাদ ও সম্পাদনা, ঋতদীপ ঘোষ, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৩১ শে জানুয়ারি ২০১২, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪, পৃ. ৬৭

১৭২. তদেব : পৃ. ৬৭

১৭৩. রায়, বিশাখা : থার্ড থিয়েটার : অন্য স্বর, অন্য নির্মাণ, থীমা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৭, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কল-২৬, পৃ. ১১০

১৭৪. সরকার, বাদল : থিয়েটারের ভাষা, অপেরা, ২৭/৬, সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-০৯, প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৯৯০, পৃ. ৫৮-৫৯

১৭৫. ঘোষ, ড. অরুপরতন ও ঘোষ, ড. অসীমরতন : অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প, ২০০৪, দ্বিতীয় বর্ষ, শরৎ সেজ'স কম্পাউন্ট, আমডিহা, পুরুলিয়া, পৃ. ৯

১৭৬. চক্রবর্তী, দেবাশিস : পরিক্রমা তিন দশক, মীরা প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৮, ৪২২, গড়ফা মেন রোড, কল-৭৫, পৃ. ৮৪

১৭৭. তদেব : পৃ. ৭৪

১৭৮. তদেব : পৃ. ১১

১৭৯. তদেব : পৃ. ২৫